যাক, যা গেছে তা যাক



অভীক দত্ত

যাক, যা গেছে তা যাক

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

☢ *Disclaimer* ☢

শহর ছেড়ে যাওয়া ভালোবাসাদের...

“বৃষ্টি পড়ার কোন সময় নেই। যখন খুশি বৃষ্টি হতে পারে। শুধু যখন বৃষ্টির সব থেকে বেশি দরকার, তখনই দেখা যাবে বৃষ্টি হবে না”।

লোকটার তার পাশে বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে। গায়ে ঘেমো গন্ধ। বাসটা ধীর গতিতে চলছে। বিশেষ লোক নেই।

সার্থক জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। আকাশ একবারে কালো করে এসেছে। যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

গতকাল দেওয়া ইন্টারভিউর রেজাল্ট বেরিয়েছে। সে চাকরিটা পায় নি। ভেবেছিল চাকরিটা পেয়ে যাবে। ইন্টারভিউ ভাল হয়েছিল।

শেষ রক্ষা হল না। ঠিক কোন কারণে সে চাকরিটা পেল না, জানতে ইচ্ছে করছিল তার। কেউ কি বলবে না সে কেন চাকরিটা পায় নি? শুধুমাত্র একটা লিস্ট টাঙিয়ে দিলে কেন দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে?

তার মতো ফেল করা বাকিদের একেক জন একেক জনের একেক রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কেউ হতাশ হয়ে চুপ করে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। কেউ কেউ তীব্র রাগে বাজে কথা বলে চলেছে।

সার্থক কিছুই বলে নি। বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে বাসে উঠে গেছে। এখন লোকটার বকবক শুনে যাচ্ছে। কন্ডাকটার শেষ সিটে ঘুমোচ্ছে। এতো শান্ত বাসে অনেকদিন ওঠে নি সার্থক।

লোকটাকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, “চুপ করুন। আমার কোন কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না। বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তার উপর আপনি ভাট বকে যাচ্ছেন। এবার থামুন দয়া করে”।

বলতে পারলো না। অচেনা লোকের সঙ্গে খারাপ করে কথা বলতে পারে না সে। চেনা লোকেদের সঙ্গে পারে।

মানুষ কাছের লোকেদের সঙ্গেই সব থেকে বেশি দুর্ব্যবহার করে। এর ব্যতিক্রমও যে একবারে নেই, তা বললে ভুল বলা হবে। অনেকেই আছে অচেনা লোকের সঙ্গেও অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। যে কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে গেছিল, সে কোম্পানির এইচ আরের লোকগুলোর ব্যবহারও অত্যন্ত খারাপ। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার পর ইন্টারভিউ নেবে বলে সারাদিন এক জায়গায় বসিয়ে রেখেছিল তাদের। খেতে অবধি যেতে দেয় নি। ভাবখানা এমন, চাকরির কী দরকার, ইন্টারভিউ দিতে এসেছো আমাদের কাছে, এতেই কৃতার্থ হয়ে যাও।

সার্থক খিদে সহ্য করেই বসেছিল। সন্ধ্যে সাতটায় ইন্টারভিউ হয়েছিল। বেশ ভাল উত্তর দিয়েছিল সে। হল না। কী আর করা যাবে। বাস থেকে নেমে দেখল লোকটা আরেকটা বিড়ি ধরিয়েছে। বাসটা চলে যেতেই তার মনে হল লোকটাকে একটা ধমক দেওয়া উচিত ছিল। এরকমই হয় তার, কাজের সময় আসল কথা মনে পড়ে না।

একটা কুকুর কাঁদছে। কুকুরের কান্না নাকি শুভ না। অমঙ্গলের প্রতীক।

ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার ভবেশবাবু দুটো চেয়ার এক করে ঘুমোচ্ছেন।
ভবেশবাবু মফঃস্বলের লোক। শেষ বয়সে অর্থ কষ্ট হওয়ায় ফ্ল্যাটে কেয়ার টেকারের চাকরি নিয়েছেন। নিচেই একটা ঘুপচি ঘরে রাতে থাকেন। দিনের বেলা সেখানে থাকা সম্ভব না। বাইরেটায় হাঁটা চলা করেন। দুপুরে এভাবেই ঘুমিয়ে পড়েন। কোন কোন দিন সারাদিন ঘুমোন। ফ্ল্যাটের লোকজনের অনেক অভিযোগ আছে ভবেশবাবুর নামে। তবে ঠিক কোন জাদুমন্ত্রে তিনি এখনো এই ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার হিসেবে চাকরি বজায় রেখেছেন, তা কেউ জানে না। অনেকেই চেষ্টা করেছিল ভবেশবাবুকে সরিয়ে দেওয়ার, শেষতক কেউ সফল হয় নি। ঘুম ছাড়া ভদ্রলোকের অন্য কোন দোষ নেই। আর সবার সেখানেই আপত্তি। কেন ঘুমোবেন? কেন জেগে থাকবেন না সারাদিন?
সার্থক কিছুক্ষণ ভবেশবাবুর দিকে তাকিয়ে লিফটের সামনে দাঁড়ালো। গরীব হতে পারেন কিন্তু ভবেশবাবু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছেন। সে তাও পারে না। ঘুম ভেঙে যায়। আজে বাজে চিন্তা মাথায় ঘিরে ধরতে শুরু করে কারণে অকারণে।
দুটো লিফট। একটা বড়, একটা ছোট।
বড়টা মাঝে মাঝেই খারাপ হয়ে যায়। কখনো দাঁড়িয়ে পড়ে, দরজা খোলে না। ফ্ল্যাটের অনেকেই আটকেছে। সে কোনদিন আটকায় নি। এমন হয় কেন জানে না সে। তার কি কপাল ভাল? তা তো মনে হয় না। বেশ কয়েকবার লটারির টিকেট কেটে দেখেছে কিচ্ছু জোটে নি। সান্ত্বনা পুরস্কারও নয়।
তাহলে? কে জানে!
বড় লিফটেই উঠল সে। দেখা যাক আজ আটকায় কি না। আটকানো উচিত ছিল। তার চাকরি হয় নি। এর মানে হল তার কপাল খারাপ। খারাপ কপালের মানুষদের জীবনেই লিফট আটকায়। সার্থক ভেবেছিল এবার নির্ঘাত লিফটটা দাঁড়িয়ে যাবে। দাঁড়ায় নি।
মসৃণভাবে তার ফ্লোরে এসে দরজা খুলে গেল। ঘরের সামনে বেশ কয়েকটা জুতো। ভুলে গেছিলো সে। আজ টুবলাইদের স্যার আসার কথা। তার ওইটুকু ভাইপোকে একজন স্যারের কাছে দেওয়া হয়েছে। সেই স্যার আবার টুবলাইয়ের মত আর চারজন ক্ষুদেকে ব্যাচে পড়ান তাদের ফ্ল্যাটেই।
বউদি বলেছিল চা পাতা শেষ হয়ে গেছে। বেমালুম ভুলে গেছে। এখন ঘরে ঢুকলেই রেগে যাবে। আবার লিফটের সুইচ টিপল সে। ছোট লিফটটা এসে দরজা খুলল। গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামতে দেখল ভবেশবাবু ঘুম থেকে উঠে উত্তেজিতভাবে লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখেই বললেন, "কী সর্বনাশ দেখো ভাই, বড় লিফটটা আবার আটকে গেছে! মহা জ্বালা হল। বাসুদা নামতে গিয়ে আটকে গেলেন"।
সার্থক চমৎকৃত হল। বাসুদা নিচের ফ্লোরে থাকেন। তাকে নামিয়ে দেবার পর লিফটটা বাসুদাকে তুলে আটকে গেল। অথচ সে আটকালো না। ভবেশবাবু লিফটের চাবি নিয়ে ছুটলেন।
কম্পাউন্ডের বাইরেই পাড়ার দোকান। চা পাতা নেওয়ার সময় ফোন বেজে উঠল, বউদি ফোন করছে। ধরল সে, "বল"।
"কী হল?"
"হয় নি গো"।
"ঠিক আছে, মন খারাপ কোর না তো। সব ভুলে যাও। বরং তুমি এক কাজ কর, ওই যে টোস্ট বিস্কুটগুলো হয় না, রাস্ক না কী বলে, নিয়ে এসো। স্যার তো আবার সেটা ছাড়া খান না"।
"ঠিক আছে"।
ফোন কেটে সার্থক বিস্কুটও নিল। একটু দূরে অতনুদা লটারি নিয়ে বসে আছে। তাকে দেখে বলল, "কী হে, নেবে নাকি এক খান? সন্ধ্যে ছ'টায় একটা ভাগ্য পরীক্ষা হবে নাকি?"
সার্থক হাসল, "না দাদা। ও আমার ভাগ্যে নেই। ছেড়ে দাও"।

অতনুদা বলল, “কার কখন ভাগ্য খুলে যায় কেউ জানে ভাই? একটা নিয়েই নাও। দেখো না”।
সার্থক চলে যাচ্ছিল। রাস্তা পার হবার ঠিক আগের মুহূর্তে তার মনে হল দেখাই যাক। সে দাঁড়িয়ে পড়ল, “ঠিক আছে। তিরিশ টাকা তো? সেভেন এইট, এই নাম্বারটা দাও”।
অতনুদা টিকেট তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, “নাম্বারটা ভাল। দেখা যাক। সবই কপাল বুঝলে না। কে কখন পেয়ে যায় কেউ জানে না”।
সার্থক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। প্রথমদিকে একটা টিকেট কেটে সে বাজেট বানিয়ে ফেলতো কোটি টাকা পেলে সে কী কী করবে। পরে বুঝল লাভ নেই। এসব তার কপালে নেই। রেজাল্ট বেরোলে বেশিরভাগ সময়েই ভুলে যায়। দেখতে দু তিন দিন দেরী হয়ে যায়। তারপর দেখা যায় ঠিকই, সে পায় নি।
বাসুদা নিচে নেমে উত্তেজিতভাবে চিৎকার করছেন, “এটা একটা ভদ্রলোকের ফ্ল্যাট? এখানে মানুষ থাকে? দু দিন পর পর কেউ না কেউ আটকে পড়বে! ইমিডিয়েটলি বিল্ডারদের কাছে যেতে হবে। হালুয়া টাইট করে দিতে হবে ওদের। দরকার পড়লে কনজিউমার কোর্টে যেতে হবে। এভাবে চলতে পারে?”
সার্থক বড় লিফটটাতেই উঠল।
সেটা আগের মতই তাকে মসৃণভাবে তাদের ফ্লোরে নামিয়ে দিল।
দরজা খোলা ছিল। সার্থক সরাসরি রান্নাঘরে গিয়ে চা পাতা আর বিস্কুট বউদিকে দিলো।
বউদি বলল, “চাকরি হয় নি তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। এসব নিয়ে একদম ভাববে না। যেদিন চাকরি পাওয়ার, ঠিক পেয়ে যাবে”, পরক্ষণে গলা নামিয়ে বলল, “বাবা কি সুস্থ হচ্ছেন বল তো? চা চাইছিলেন কিন্তু। কাল অবধি কী বলছিলেন, নিজেই বুঝছিলেন না। এখন দশ মিনিট পর পর বউমা চা, বউমা চা বলে চিৎকার জুড়ছেন”।
সার্থক বলল, “আমার একার বাবা না। তোমার বরেরও বাবা। ভুলে যেও না। করে ফেলো। শ্বশুরের সেবা কর। তোমারই ভাল হবে”।
বউদি শ্বাস ছাড়ল, “আর ভাল! তোমার কী মনে হয় আর কিছুতে ভাল হবার আছে? টুবলাইদের স্কুলে আবার পরীক্ষার রুটিন দিয়েছে। আমি পাগল হয়ে যাবো। আর পারবো না”।
সার্থক বলল, “ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ালে এসব হবেই। এসব নিয়ে ভেবো না তো”।
বউদি বলল, “ফেল করুক। আমি আর পারছি না। সারাক্ষণ ছেলের পেছন পেছন দৌড়নো সম্ভব না। দেখবে একটু পরে স্যারটা বেরোনোর সময় গাদা গাদা নালিশ করে যাবে। তাতে আমার মাথা যাবে গরম হয়ে। ছেলেটাকে দু ঘা দেবো আবার। আর কত চাপ দেবো?”
সার্থক বলল, “চাপ তো দিতেই হবে। রাজ্যের বাইরে বেরোতে হবে। আরো ভালো হয় কানাডা চলে গেলে। একবারে নিশ্চিন্তি। যাবার সময় তোমাদের সব নিয়ে যাবে। তোমরা হাল ছেড়ো না। লড়ে যাও”।
বউদি তার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, “ইয়ার্কি মেরো না। টেবিলে তোমার খাবার রেখে দিয়েছি। খেয়ে নাও। ভুলে যেও না। চা খাবে?”
সার্থক বলল, “দাও। খেয়ে নি”।
পরোটা হয়েছে। সার্থক খেতে খেতেই শুনতে পেল বাবা চিৎকার শুরু করেছে, “চা দিও বউমা”।
বউদি বলল, “দিচ্ছি বাবা”।
এক মুহূর্ত বিশ্রাম পায় না বউদি। একবার টুবলাই, পরক্ষণে বাবা, দাদা অফিস থেকে ফিরলে তার পিছনে, সর্বক্ষণ কিছু না কিছু করে যাচ্ছে। খিটখিটেও হয়ে গেছে। বউদির জায়গায় যে কেউ থাকলে একইরকম হয়ে যেতো। সার্থক শ্বাস ছাড়ল। তাদের জন্য বউদি অনেক করে। অন্য কেউ হলে নাও করতে পারতো।
তাকে একটা কিছু করতে হবে। চাকরি না হলে ব্যবসা, যা হবে, যেমন হবে। এভাবে দাদার ঘাড়ে চেপে চলা যায় না। আজকাল লজ্জাটা বাড়তে বাড়তে খুব বড় হয়ে যাচ্ছে। এত বড় হচ্ছে যে কোন উপমাও

দেওয়া যাচ্ছে না।
খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে বাবার কাছে গিয়ে বসল।
বাবা তাকে দেখে বলল, “চা দিতে কত দেরী করে দেখেছিস? এই জন্য পরের সংসারে থাকতে নেই”।
সার্থক লজ্জিত হল। কষ্টও হল। বাবার বোধ হয় আর বেশি দিন নেই। মৃত্যুর আগেই মানুষ এরকম বাজে বকে। এই কথা তার বাবা সজ্ঞানে থাকলে কোন দিন বলত না।
নাকি এই কথাগুলো অবচেতন মনের প্রতিফলন? অবচেতন মন এত জটিল হয়?

শহরে নতুন নতুন কফিশপ হচ্ছে। তাদের কলেজে পড়ার সময় এই কফিশপগুলো এক রকম ছিল। এখন আরেক রকম, আরো আধুনিক কফিশপ তৈরি হয়েছে। সকাল থেকে এই সময়টুকুর জন্যই তো সে অপেক্ষা করে থাকে। কখন বিদীপ্তার সঙ্গে দেখা হবে।

বিদীপ্তাকে দেখলে তার মনে হাজার ওয়াটের হ্যালোজেন জ্বলে ওঠে। এই দেখাদেখির বিলগুলো যদিও তাকেই দিতে হয়, তবে তাতে তো তার অসুবিধা হবার কথা না!

"এখন আনবক্সিং এর যুগ। পাবলিক অনলাইনে অর্ডার করছে, জিনিস আসছে। প্যাকেটে যেটা আসছে, সেটা আনবক্স করে ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে। ভাবা যাক, বিয়ের পর ভ্লগাররা বউ আনবক্স করছে। কী বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হবে", ভিডিওর ভেতরেই কারা যেন জোরে হেসে উঠল।

মোবাইলে ভিডিওটা দেখছে বিদীপ্তা। মন দিয়ে। অফিস থেকে বেরিয়ে এই রেস্তোরাঁয় দেখা করতে আসার কথা ছিল। বিদীপ্তা দেরী করেছে। আসার পর থেকে এই ভিডিওটা দেখে যাচ্ছে।

অতীন প্রথমে মুগ্ধ হয়ে বিদীপ্তাকে দেখছিল। তারপর কিছুক্ষণ উসখুস করে বলল, "তুমি কি চাও? ভ্লগিং করবে? করতে পারো তো"।

বিদীপ্তার ফোনটা বেশ দামী। ভিডিওটা বন্ধ করে ফোনটা টেবিলের উপরে রেখে বলল, "জানি না। করতেও পারি। নাও পারি। মুডের উপর ডিপেন্ড করছে। বেশির ভাগ সাব স্ট্যান্ডার্ড লোকজন ভ্লগ করছে। তোমার বউও করতে পারে। কিছুই তো করে না। শুধু বাচ্চা বড় করলেই হয়? আর হ্যাঁ, আমার কথা যদি বল, আমার মত লোকেদেরও করা উচিত। সোস্যাইটিতে কিছু ভ্যালু অ্যাড হবে। যাক গে, তোমার বাড়ির লোক কেমন আছে? সব ঠিক ঠাক আছে?"

অতীন বলল, "ওই আছে"।

বিদীপ্তা বলল, "ভালো থাকলেই ভালো। আমার বাড়ি থেকেও বিয়ের কথা বলছে"।

অতীন ভ্রূ কুঁচকাল, "তোমার আবার বাড়ি থেকে কবে থেকে এসব শুরু করলো? তুমিই তো বলেছিলে বাড়ির লোক এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাবা মা একবারে অন্য ভাবে মানুষ করেছেন!"

বিদীপ্তা গতকাল চুল কালার করেছিল। তার সঙ্গে স্পাও করেছিল হয়তো। চুলটা ভারি সুন্দর লাগছে। সে চুল ঠিক করতে করতে বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বাবা মা ছাড়াও আরো অনেকে পড়েন। এটা মানো তো? মামাবাড়ির লোকজন, মাসীরা, ওদিকে বাবার দিকের যারা আছে, পিসী, তাদের ছেলে মেয়ে, প্রশ্নে প্রশ্নে খান খান করে দেয় দেখা হলেই। হাই স্ট্যাটাস, হাই সোসাইটির লোকেদের মধ্যেও কানাকানি হয়। গসিপিং হয়, বিচিং হয়। আমার বাবার প্রপার্টি নিয়েও একটা ঝামেলা চলছে। বাবাকে কিছু লোক কান ভাঙিয়ে যাচ্ছে। এদের মুখ বন্ধ করার জন্য আমাকে কিছু তো একটা করতেই হবে। একা একা থাকা মানে অনেক কথা ওঠে"।

অতীন অন্যমনস্ক হয়ে বলল, "হু, বুঝলাম"।

বিদীপ্তা বলল, "বুঝলে হবে না। ডিসিশন নিতে হবে। যদি বেরিয়ে যেতে চাও, বলে দাও। আমাকে ঝুলিয়ে রেখো না"।

অতীন বিদীপ্তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এগুলো পরেও ডিসকাস করা যায়। এসব বলে সময়গুলোকে নষ্ট করছো কেন বল তো?"

ব্রাউনি বলা হয়েছিল। দিয়ে গেলো। টুবলাই ব্রাউনি খেতে ভালোবাসে। মাঝে মাঝে মনে হয় টুবলাইয়ের জন্য ব্রাউনি নিয়ে গেলেই হয়, শেষমেশ আর নিয়ে যাওয়া হয় না। ফেরার দিকে এতো তাড়া থেকে, কিছুই হয় না তখন।

বিদীপ্তা কাঁটা চামচ প্লেটের উপর নামিয়ে রেখে বলল, "কারণ এগুলো আমাকেই ভাবতে হবে। তোমার কিছু না, তুমি আমাকে নিয়ে ঘুরবে, শোবে, নিজেও জানবে না ঠিক কী করতে হবে। এক সময় বলবে বাবু, আমায় ছেড়ে দাও। আমি বউয়ের আঁচলের তলায় গিয়ে ঘুমোই। তাই বলছি। ভেবে বল কী করবে। যদি বল আমাকে যেতে দিতে চাও, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আমার লাইফ, আমি আমার মত করে লিড করে নেবো"।

অতীন কাতর গলায় বলল, "এসব নিয়ে এখন ভাবতে হবে? আমরা একটু ভালোবাসার কথা বলতে পারি না?"

বিদীপ্তা বলল, "ভালোবাসার কথা বলার জন্য গোটা জীবন পড়ে আছে। তোমাকে আগে ঠিক করতে হবে তুমি কার সঙ্গে জীবন কাটাবে। তোমাকে এবার ভাবতে হবে। কতদিন আর এসব ভাবনা পোষ্টপন করে যাবে?"

অতীন চুপ করে রইল। বিদীপ্তা বলল, "ভাবো। ভাবো। ভাবা প্র্যাকটিস কর। আমাকে তোমার এসকেপ রুট করতে চাইছো ভালো কথা, কিন্তু আমারও একটা লাইফ আছে। ভুলে যেও না। আমাদের কম্পাউন্ডে একটা কাপল পার্টি আছে। চাইলেও কি তুমি সেখানে আমার সঙ্গে পারটিসিপেট করতে পারবে? পারবে না, কারণ তুমি মন থেকে সব সময় লুকিয়ে থাকতে চাও। এভাবে লুকিয়ে থেকে আর কতদিন অতীন?"

অতীন আশে পাশে তাকালো। না, রেস্তোরাঁটা এখনো ফাঁকাই আছে। তাদের কথা কেউ শুনছে না। সে বলল, "তা আছে। তোমার লাইফ আছে। অস্বীকার করার কিছু নেই"।

বিদীপ্তা বলল, "তবে? আমি এভাবেই স্যাটেলাইটের মত সারাজীবন থাকবো? তোমাকে কেন্দ্র ঘুরে ঘুরে বেড়াবো? কেন বল তো? সেটা আমি কেন করবো? আর সেটা কি সম্ভব? তুমি নিজেই বল।"

অতীন কথা ঘোরাতে চাইলো, "তোমার বাবা মা কেমন আছেন?"

বিদীপ্তা বলল, "ভাল নেই। মুখে কিছু বলে না, ভেতরে ভেতরে টেনশনে থাকে। সবই বুঝি। ওদের বয়স হচ্ছে। এখন বাইরের লোকে কখন কী বলে দিয়ে চলে যায়, বাবা মায়ের মুখ গোমড়া হয়ে যায়। কখনো কখনো কথা বলাও বন্ধ করে দেয়"।

অতীন বলল, "এসে অবধি তো ভ্লগ ভ্লগ করছিলে। হঠাৎ করে ঠিক কী হল বল তো?"

বিদীপ্তা অতীনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হল জানো না তুমি? নাকি বুঝতে চাও না"।

অতীন বলল, "বেশ। অহনাকে বলি। দেখি কী বলে"।

বিদীপ্তা বলল, "বলবে?"

অতীন বলল, "বলতে তো হবে। ও বাড়িতে বাবা আছে, ভাই আছে, টুবলাই..."

বিদীপ্তা বলল, "দেখছো তো, আমি কেমন ভ্যাম্প হয়ে গেলাম? আমি কিন্তু ভ্যাম্প হতে চাই না। তোমাকে ঠিক করতে হবে তোমার জীবনে আমার ভূমিকা কোনটা।"

অতীন বিদীপ্তার দিকে তাকিয়ে হাসল, "ভ্যাম্প বা ভিলেনের কিছু নেই। ঠিক করেছি বেরিয়ে যাবো। সেটাকে একটা হেলদি ওয়েতে এক্সিকিউট করতে হবে। ঠিকই তো, লুকিয়ে চুরিয়ে এভাবে চলাটা ঠিক হচ্ছে না"।

বিদীপ্তা বলল, “রাইট। বুঝেছো, তার জন্য থ্যাংকস। দেখো তুমি কী করবে। আমি অপেক্ষা করছি। সব মানুষের এত ভাগ্য হয় না। এখনকার দিনে কেউ আমার মত অপেক্ষা করে বসে থাকবে না। তুমি খেয়ে নাও। খাবার নষ্ট কোর না। ফুড ইজ অসাম হিয়ার। খাও”।

অতীন মাথা নাড়ল। সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আবার? অথচ সে তো প্ল্যান করেই নিয়েছিল। তাহলে আবার এলোমেলো হবার কী আছে?

সার্থক ডাকল, “হৃদি”।

হৃদির জন্য সে একটা চকলেট এনেছিল। হৃদির চোখ সেটার দিকে। বেচারি ভদ্রতাবশত চকলেটটা খেতে পারছে না সে ঠিক করেছে স্যার চলে গেলে তারপর খাবে।

হৃদির ঘরটা ভারি সুন্দর। বউদিকে বলতে হবে টুবলাইয়ের ঘরটা এভাবে সাজাতে হবে। তাদের ফ্ল্যাটে বউদি একাই সারাদিন ঘর সাজিয়ে যায়। সপ্তাহে একদিন ঘরের ধুলো ঝাড়া হয়। সেদিন অতীন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অতীনের ডাস্ট অ্যালার্জি আছে। সে একবারে ধুলো সহ্য করতে পারে না।

সার্থক আপাতত বিরক্ত। তার ছাত্র হৃদি পড়াশুনো করে নি। হৃদি সবসময় পড়া করে রাখে। আজ কেন করে নি সেটা জানা দরকার।

সার্থকের দিকে তাকিয়ে সে বলল, “ইয়েস স্যার”।

সার্থক বলল, “পড়া কর নি কেন?”

হৃদি বলল, “কালকে বাড়িতে অনেক লোক এসেছিল স্যার। আমি চিনিও না তাদের। চিকেন হয়েছিল, মাটন হয়েছিল। আইসক্রিমও হয়েছিল। পড়ার সময় পাই নি স্যার, পড়ব আর কী করে? দিদির বিয়ে তো”।

সার্থকের বুকে ধাক্কা লাগল। সুনয়নার বিয়ে? যার বিয়ে, সে তো কিছু বলে নি তাকে। না বললেও হতো, তবু... কেন বলবে না? বললে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো? একে চাকরিটা না পাওয়ার কষ্ট, তারপর এই খবরটা তাকে অনেক খানি নাড়িয়ে দিল।

কোনমতে সামলে নিয়ে বলল, “ঠিক আছে। পড়া করে রাখবে। ম্যাথস বইটা দাও”।

হৃদি অঙ্ক বইটা এগিয়ে দিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে সুনয়না ঢুকল। সার্থকের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে হৃদিকে বলল, “জল এনে দে তো”।

হৃদি তার দিকে তাকিয়ে বলল, “মে আই গো স্যার”?

সার্থক বলল, “যাও”।

হৃদি ঘর থেকে বেরোল।

সার্থক বইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুনয়না গলা খাকরাল।

সার্থক তাকালো না। ড্রেসিং টেবিল থেকে একটা ক্রিম নিয়ে সেটা সশব্দে টেবিলে রেখে বলল, “কী যে হয় এদের, কিচ্ছু পাওয়া যায় না”।

হৃদি জলের বোতল নিয়ে এলো।

সুনয়না জলের বোতলটা নিয়ে বলল, “পড়া করেছিস?”

হৃদি বলল, “না, স্যারকে বললাম তো। তোর বিয়ে”।

সুনয়না জ্বলন্ত চোখে হৃদির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোকে কতবার বলা হয়েছে বাজে কথা বলবি না? কে বলেছে তোকে আমার বিয়ে?"

হৃদি বলল, "সবাই বলল তো। তোকে দেখতে এসেছিল, তুই জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বললি, কাকাই বলল বিয়েবাড়িতে কী কী খাবে, তুই বললি কর্নেটো আইসক্রিম করতে, স্যারকে বলব না? স্যারকেও তো নেমন্তন্ন করবে বাবা"।

সার্থক বলল, "ঠিক আছে, যখন বিয়ে হবে, তখন দেখা যাবে। সবাই খুব আনন্দ করবে। আমরা ভাল মন্দ খাওয়া দাওয়া করবো। কিন্তু পড়াশুনা না করলে পরীক্ষায় ফেল করে যাবে তো। তুমি খাতাটা বের কর তো এখন"।

সুনয়না সার্থকের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চাইলো, সার্থক তাকালো না। হৃদির খাতাটা নিয়ে বই খুলে অঙ্ক দিতে লাগল।

সুনয়না ঘর থেকে রাগ করে বেরিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

হৃদি সেদিকে তাকিয়ে ঠোঁট উলটে বলল, "কাল থেকে এরকম করছে"।

সার্থক অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "ঠিক আছে। তুমি পড়ায় মন দাও। দিদির বিয়ে নিয়ে এত চিন্তা করতে হবে না। আর ইচ্ছে হলে চকলেটটা খেয়ে নাও, লজ্জা পেও না"।

হৃদি খুশি হল। চকলেটটা খেতে শুরু করল।

হৃদিকে পড়িয়ে বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাস স্ট্যান্ডে এসে দেখল সুনয়না তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে বলল, "আমি বলতাম। মানে বুঝতেই তো পারছো, আমাদের তো এমনিতেই কিছু হত না। অফিশিয়াল ব্যাপার তো একটা হয়েই গেছিল তাই না?"

সার্থক বলল, "না না, ঠিক আছে। খুব ভাল খবর। না বললেও কোন অসুবিধে ছিল না। কনগ্র্যাচুলেশন্স"।

সুনয়না আহত চোখে তাকিয়ে বলল, "কী হল? এটুকুই? কনগ্র্যাচুলেশন জানালেই হয়ে যাবে?"

সার্থক বলল, "তুমি তোমার উড বির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলবে, কত পরিকল্পনা করবে, হয়তো আজকে ফোন করাও শুরু করে দিয়েছো, আর তারপরে আমাকে বার্নল লাগাতে এসেছো কেন? কী দরকার আছে? এসবের কোন দরকার নেই। একবারে নিশ্চিন্তে থাকো, আমার দিক থেকে কোন চাপ নেই। বাসটা এসে গেছে। বাই"।

সুনয়না কিছু বলার আগে বাসে উঠে পড়ল সার্থক। এই সম্পর্কের সবটাই আদতে তার সাফল্য ব্যর্থতার উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে একজন হেরে যাওয়া মানুষ। কিছু করতে পারলো না।

পাড়ার মোড়ে নেমে দেখল দাদার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। শম্ভুদার দোকানে দাঁড়িয়ে দাদা সিগারেট খাচ্ছে। বেশ চিন্তিত মুখ। অফিসে কি কোন সমস্যা হয়েছে? সার্থককে দেখে অতীন হাত নেড়ে ডাকল, "শোন, এদিকে আয়"।

সার্থক অতীনের দিকে এগিয়ে গেল, "বল"।

অতীন বলল, "তোর সঙ্গে কথা আছে। বাড়ি গেলে বলা যাবে না। এখানেই শুনে যা"।

সার্থক অবাক হয়ে বলল, "কী কথা"?

অতীন সার্থকের দিকে কয়েক সেকেন্ড বলল, "ছাড়। পরে বলবো"।

সার্থক বলল, "কেন পরে বলবি? কী নিয়ে আবার চিন্তায় পড়লি তুই? বউদি বলছিল তোরা বেড়াতে যাবি নাকি, বাবাকে নিয়ে ভাবিস না, আমি সামলে নেবো"।

অতীন ভ্রূ কুঁচকালো, "বেড়াতে যাবার কথা বলেছে নাকি আবার?"

সার্থক বলল, "হ্যাঁ, টুবলাইয়ের পরীক্ষার পরের ছুটিতে যাবার কথা হচ্ছিল তো"।

অতীন মাথা নাড়ল, “ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। না না, সেসব কথা না। ওসব নিয়ে আমি ভাবছি না কিছু। বেড়াতে তো যাওয়াই যায়। তাতে কী হয়েছে?”

সার্থক বলল, “তাহলে কী কথা?”

অতীন বলল, “বাদ দে। তুই এক কাজ কর, গাড়িটা নিয়ে গিয়ে পার্কিং এ রেখে দে। আমি একটু হেঁটে নি। বহুদিন হাঁটা হয় না”।

সার্থক অবাক হয়ে অতীনের দিকে তাকালো।

দাদার কী হল আবার?

সম্পর্ক লুকিয়ে চলা বড় সোজা কথা নয়।

বিদীপ্তার সঙ্গে দেখা করে ঘরে ফেরার পর প্রথম প্রথম অতীন ভয়ে ভয়ে থাকতো। বিদীপ্তা খুব সুন্দর একটা পারফিউম ব্যবহার করে। বিদীপ্তাকে আদর করলে সে সুগন্ধ তার শরীরেও চলে আসে।

প্রথম প্রথম অতীন ভাবতো বিদীপ্তা সে গন্ধ পেয়ে যদি ঝামেলা শুরু করে দেয়? যদি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে? ফেরার আগে চুইং গাম খেয়ে নিতো। ঘরে ফিরেই চেঞ্জ করে নিতো।

পরে দেখা গেল অহনার তার দিকে তাকানোরও সময় থাকে না। এদিন অতীন ঘরে ঢুকে দেখলো অহনা টুবলাইকে পড়াচ্ছে। তাকে দেখে কেজো গলায় বলল, "চা দেবো?"

অতীন বলল, "দাও"।

টুবলাই বাবাকে দেখে বলল, "বাবা, আমাকে একটা টিনটিন কমিক্স কিনে দেবে?"

অতীন বলল, "দেবো। কোনটা কিনবো?"

টুবলাই বলল, "আমাজনে দেখে কিনবো"।

অহনা টুবলাইকে চোখ পাকাল, "অ্যাই খুব অ্যামাজন শিখেছিস না? এদিকে পড়ার নামে দেখা নেই। পড় শিগগির। ল্যাজ গজিয়ে গেছে একবারে। তুমি একদম ওসব কিনে দেবে না তো। যত কমিক্স পড়বে, তত পড়া ভুলে যাবে"।

অতীন বাথরুমে ঢুকল। পড়াতে বসলে অহনার চিৎকার শুরু হয়ে যায়। টুবলাই বেশ অবাধ্য। সে একবার পড়াতে চেষ্টা করেছিল। একদিনেই বুঝে গেছিল টুবলাইকে পড়ানো একটা অসম্ভব কাজ। টুবলাই অসম্ভব দুরন্ত। অহনা পড়াতো প্রথমটা।

পরে বুঝল টুবলাই ঘরের থেকে বাইরের লোকের কথা বেশি শোনে। তখন একজন টিউটর দেওয়া হল।

বিদীপ্তার কথাটা অহনাকে বলতে হবে। বিদীপ্তা বলছিল "গ্রোন আপ" মানুষদের কথা। আরেকজনকে ভাল লাগতেই পারে। বর্তমানকে প্রাক্তন করতে হলে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। বোঝাতে হবে। অহনা এসব কিছুই জানে না। ওর খোরপোষের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদীপ্তা কি তার বাবাকে দেখবে? না মনে হয়।

সেও কি টুবলাইকে ছেড়ে থাকতে পারবে? তা মনে হয় পারবে।

সে পারবে। অহনা পারবে না। ছেলের সঙ্গে সারাদিন অহনা থাকে। সেই ভোর পাঁচটায় অ্যালার্ম দিয়ে উঠবে। রান্না বসাবে। ছেলেকে তৈরি করবে। টুবলাই পুলকারে ওঠার আগে ভাত খেয়ে যায়। স্কুল থেকে ফিরে আবার ছেলেকে নিয়ে ঘুমাবে। ঘুম থেকে তুলে খেলাতে নিয়ে যাবে পার্কে। ফেরার পর আবার পড়াতে বসাবে। এই সময়গুলোর মধ্যে বাবাকে বার বার চা দেওয়া, ওষুধ দেওয়া আছেই।

পাশে ঘুমনোর সময় অহনার গা থেকে একটা ঘামের গন্ধ আসে। এই অহনা আর বিয়ের পরের অহনা এক না। পুরোটাই যেন বাংলা সিরিয়ালের মত ব্যাপার।

বিদীপ্তার সঙ্গে তার প্রেমটা অবশ্য সিরিয়ালের মত হয় নি। হঠাৎ করেই হয়ে গেছিল। বিদীপ্তা বলেই দিয়েছিল তার বিবাহিত পুরুষই পছন্দ। বারবারই বলে থাকতে না চাইলে বেরিয়ে যেতে পারে সে। অতীন পারে না। বিদীপ্তা তাকে উত্তেজিত করে। শারীরিক এবং মানসিকভাবে দুভাবেই। বিদীপ্তার সঙ্গে থাকলে অতীনের আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। অহনা সেটা করে না।

অহনার সঙ্গে অতীনের বিচ্ছেদটা অবশ্যাম্ভবী।

অথচ এ সংসারে অহনা অপরিহার্য। বলা ভাল, এ সংসারে অহনা নিজেকে অপরিহার্য করে নিয়েছে।

একটা মধ্যপন্থা বের করতে হবে। তাকে সেটাই ভেবে বের করতে হবে যেখানে বাবা ভাইয়ের সঙ্গে এ বাড়িতে অহনাও থেকে যায় টুবলাইকে নিয়ে। সে তো বাহুল্য। থাকলেও হয়, না থাকলেও হয়। আপাতত বিদীপ্তার ফ্ল্যাটে থাকা যায়। নইলে অন্য কোন বাড়ি ভাড়া নিয়ে তারা থাকতে পারে। অহনাকে এগুলো বলাটাই চাপ। ইদানীং অহনা ভীষণ হাইপার হয়ে গেছে। টুবলাইকে পড়াতে গিয়েই হয়তো। একটুতেই রেগে যায়। চিৎকার করতে শুরু করে দেয়। সে সবটা বললে কী হতে পারে?

রেগে যেতে পারে, আবার হতাশায় ভেঙে গিয়ে ভয়াবহ কোন সিদ্ধান্তও নিয়ে নিতে পারে। এমন কিছু করতে হবে যাতে সব কিছু নির্বিঘ্নে হয়। ডিভোর্স জিনিসটা সমাজ ঠিক চোখে নেয় না। হাজার হ্যাপা আছে। ভাইকে দিয়ে বলানোটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? নাকি সেই সরাসরি কথা বলবে?

“কী করছো এতক্ষণ? চা হয়ে গেছে। এর পর তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে”।

দরজা ধাক্কাল অহনা।

বাথরুমে সময় লাগছিল। অহনার ডাক শুনে বলল, “আসছি আসছি। তাড়া দিও না তো”।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে অতীন চা নিয়ে টুবলাইয়ের পাশে বসল। টুবলাই তাকে দেখে খুশি হয়েছে। কথা বলতে চাইছে। অহনা এই সময় টুবলাইকে কথা বলতে দেয় না। একবার কথা শুরু করলে পড়া থেকে মন উঠে যায়।

অতীন ছেলের দিকে তাকালো। ছেলেটা মার মত দেখতে হয়েছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

অহনা বলল, “তুমি টিভি দেখো গে। তুমি এখানে থাকলে কিন্তু ও পড়বে না। পরীক্ষার পর নিয়ে ঘুরে বেরিও”।

অতীন চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, “যাচ্ছি। পরীক্ষার কথায় মনে পড়ল, তুমি কি ভাইকে বলেছো পরীক্ষার পর বেড়াতে যাবে?”

অহনা বলল, “কেন? তুমিই তো বলেছিলে যাবে। বললে যে ছুটি ম্যানেজ করে ফ্লাইটের টিকেট কাটবে? আজকাল সব ভুলে যাও নাকি? আশ্চর্য! কী হয়েছে তোমার, সব ভুলে যাচ্ছো কী করে?”

অতীন বলল, “ও। হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। ঠিক আছে, কবে শেষ হচ্ছে যেন?”

অহনা বলল, “চব্বিশে। দেখো কী করবে। আমার কোন ব্যাপার না। তুমিই বলছিলে বেড়াতে যাওয়া হয় না অনেকদিন”।

অতীন বলল, “হু”।

অহনা বলল, “কী হল? তোমায় অন্যমনস্ক লাগছে কেন? কিছু হয়েছে অফিসে?”

অতীন জোরে জোরে মাথা নাড়ল, “না না, কিছু হয় নি”।

টুবলাই বলল, “বাবা, টয়ট্রেন চড়ব”।

ছেলেটা ট্রেন পাগল। অতীন শ্বাস ছাড়ল। বেড়াতে যাবে?

ওখানে গিয়ে বলবে অহনাকে? খারাপ হয় না ব্যাপারটা।

সেটা করা যেতে পারে।

“কী হয়েছে তোমার? এসেই ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছো কেন?”
অহনা সার্থকের ঘরের বাইরে থেকেই প্রশ্ন করল।
সার্থক বলল, “চা দেবে বউদি? মাথাটা খুব ধরে আছে”।
অহনা বলল, “চা এনেছি তো। আলো জ্বালাই?”
সার্থক বলল, “তুমিই সাক্ষাৎ দেবী। জ্বালাও”।
অহনা আলো জ্বেলে সার্থকের ঘরের টেবিলে চায়ের কাপ রাখল। বলল, “কী হয়েছে?”
সার্থক বলল, “চাকরিটা হল না, তারপর ওই যে মেয়েটা ছিল, ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল”।
অহনা বলল, “এটা কোন ব্যাপার হল? একদিন দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে”।
সার্থক বলল, “সে তো জানি, কিন্তু সে একদিনটা কবে সেটাই বুঝতে পারছি না”।
অহনা বলল, “হু। আর?”
সার্থক বলল, “বিয়ে ঠিক হয়েছে এক জিনিস। সাত দিনও হয় নি ঠিক ঠাক ব্রেক আপ হয়েছে, হবু বরের সঙ্গে আবার হেসে হেসে গল্প করেছে, বিয়েতে কোন আইসক্রিম দেওয়া হবে সেটা নিয়েও গল্প হয়েছে। এসব করে আবার আমার কাছে ড্রামা করতে এসেছে”।
কথাটা বলে সার্থক হেসে দিল।
অহনাও হাসল। হাসতে হাসতে বলল, “তাহলে তো মিটেই গেল। বোঝা গেল ব্যাপারটা সিরিয়াস ছিল না। এর জন্য আলো নিভিয়ে শুয়ে থাকা অর্থহীন”।
সার্থক বলল, “সিরিয়াস ছিল না হয় তো। বুঝি না ঠিক। কোনটা সিরিয়াস ছিল সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না। তবে ইদানীং কী মনে হচ্ছে জানো?”
অহনা বলল, “কী মনে হচ্ছে?”
সার্থক বলল, “আমার দুটো বন্ধু ব্যাঙ্গালোরে চলে গেছে। মাঝে মাঝেই ফোন করে বলে ওখানে অনেক কাজ আছে। ভাবছি চলে যাই”।
অহনা বলল, “চলে যাবে?”
সার্থক বলল, “এখানে কিছু হবে না বুঝলে। একটা আধটা যাও বা চাকরি আছে প্রাইভেটে, তার মাইনে একবারে কম। ভেবেছিলাম খুব বেশি লোক হয়তো অ্যাপ্লাই করবে না। গিয়ে দেখা গেল সেখানেও বিরাট লাইন। কাঁহাতক আর তোমাদের সংসারে বসে বসে খাবো বল তো?”
অহনা বলল, “একটা চড় মারবো। আজেবাজে কথা বলবে না। খাবার কেউ জোগায় না। ওটা নিজের ভাগ্যে জুটে যায়। দাদা আছে কী করতে? তাছাড়া বাবার পেনশনও আছে। নিজে টিউশন করেও রোজগার করো। তোমাকে কারো সংসারে খেতে হচ্ছে কে বলল?”
সার্থক বলল, “তাও। শেষ মেশ হয়তো ওই ব্যাঙ্গালোরেই চলে যেতে হবে”।

অহনা বলল, “যেতে গেলে যাবে। তবে যাবার আগে শেষ চেষ্টাটুকু করে তারপরেই যাবে। যেখানে যা চাকরি আছে, দশ হাজার হোক, পনেরো হাজার হোক, অ্যাপ্লাই করে দাও। যেটায় পাবে, সেটাতেই ঢুকে যাও। বাছাবাছি কোর না”।
সার্থক বলল, “নাহ। বাছাবাছি আর কে করছে? বাছাবাছি তারাই করে, যাদের হাতে অপশন থাকে। আমার হাতে কোন অপশনই নেই”।
অহনা বলল, “মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু আটকাতে তো পারবো না। যেতে হলে যেতে হবে। এভাবেই সবাই চলে যাবে একদিন। কী ভয়াবহ ব্যাপার। আচ্ছা, তোমার দাদার চাকরিতে কোন ভয় টয় নেই তো? ওদিকেও তো ছাটাইয়ের গল্প শুনি মাঝে মাঝে। কেমন টেন্সড হয়ে থাকে অফিস থেকে ফিরে”।
সার্থক বলল, “না না। ওসব নেই। ছাটাই হলেও দাদার চাকরির অভাব হবে না। এক্সপেরিয়েন্সের একটা দাম আছে। আমার তো সেটাই নেই। কোথাও চাকরি খুঁজতে গেলে শুনতে হয় এক্সপেরিয়েন্স কত? আরে মায়ের পেট থেকে পড়েই তো কেউ আর এক্সপেরিয়েন্সড হয় না। এক্সপেরিয়েন্স চাকরি করতে করতেই বাড়ে। ফ্রেশারদের বাজারগুলোই পুরো মরে গেছে”।
অহনা পাংশু মুখে বলল, “কী জানি বাপু। আজকাল খুব ভয় লাগে। খারাপও লাগে। নিজে যদি একটা চাকরি বাকরি কিছু একটা করতাম, তাহলে একটা হেল্প করতে পারতাম। সেটাও তো করতে পারলাম না। বসে বসে বরের টাকায় খাওয়া কি কোন কাজের কথা?”
সার্থক বলল, “তুমি যেটা কর, সেটা চাকরির থেকে কোন অংশে কম না। এসব নিয়ে ফালতু ভেবে মন খারাপ কোর না তো। একটা চাকরি পেতে দাও শুধু, এত আজেবাজে ভাবনা আর ভাবতে হবে না”।
অহনা বলল, “না গো, মেয়েদেরও নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত। টাকা পয়সার জন্য সব সময় হাত পাততে ভাল লাগে না। বড্ড খারাপ লাগে। ঠিকই তো, এত খাটনির টাকা আমি নিয়ে নিচ্ছি”।
সার্থক রেগে গেল, “বার বার এই কথাগুলো বলবে না তো। এত হীনমন্যতায় ভুগো না। আর বাংলা সিরিয়ালগুলো দেখা বন্ধ কর”।
অহনা বলল, “তোমার কি ওই মেয়েটার জন্য খুব মন খারাপ লাগছে? আচ্ছা, আমি একবার ওর বাবার সঙ্গে কথা বলে দেখবো?”
সার্থক বলল, “ক্ষেপেছো? বললাম না তোমায়, উড বির সঙ্গে হেসে টেসে এসেছে। তার মানেই গল্প ফিনিশ। যাও তো, টুবলাইকে পড়াও গিয়ে। বেশি ভেবো না”।
অহনা বলল, “হাসতে হয়। তুমি বুঝবে না। যখন কিছু করার থাকে না, পালাতে হয়। মেয়েটা পালাতেই চায় হয়তো। ভাল থাকার অভিনয় করেই তো জীবনটা কাটিয়ে দিতে হয়। কী করবে বল? এ নিয়ে আর কথা বলে তোমার মন খারাপ করবো না। তুমি ব্যাঙ্গালোর চলে যাবে, বাবাই বা আর কতদিন, টুবলাইও বড় হয়ে বাইরে যাবে হয়তো... ধীরে ধীরে এই ফ্ল্যাটটা খালি হয়ে যাবে বল? উফ, কী ডিপ্রেসিং”।
মুখ কালো করে বসে রইল অহনা।

শুয়ে পড়লেই আজকাল ঘুম আসে না। মাথায় চিন্তারা ভিড় করতে শুরু করে। হঠাৎ করে বুক ধড়ফড় করে। টেনশন হয়। সার্থক জানলা দিয়ে বাইরের শহরটা দেখছিল। অসংখ্য বাড়ি, অসংখ্য মানুষ, ফেসবুক দেখে মনে হয়, এরা কেউ খারাপ নেই, সবাই ভীষণ ভীষণ ভাল আছে। কিন্তু আদতেই কি তারা ভালো আছে? ভালো থাকা এতো সোজা?

মেসেজ টোন এল।

-ঘুমিয়ে পড়েছো?

সুনয়না মেসেজ করেছে। সার্থক দেখল শুধু। রিপ্লাই করল না।

সুনয়না আবার লিখল, "কী হল? কথা বলবে না?"

সার্থক এবার লিখল, "তোমার উড বি কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ল কেন?"

সুনয়না লিখল, "ফোন করব?"

সার্থক লিখল, "কী করতে বল তো?"

সুনয়না অপেক্ষা না করে ফোন করল তাকে।

সার্থক ফোন ধরল, "বল"।

সুনয়না বলল, "আমাদের তো অফিশিয়ালি ব্রেক আপ হয়ে গেছে। তুমিই তো কতবার করে ব্রেক আপ করে নিতে বলতে। এখন কেমন কেমন করছো।"

সার্থক বলল, "রাগি নি। রাগার মত কিছু হয়ও নি"।

সুনয়না বলল, "তাহলে রিপ্লাই করলে না কেন?"

সার্থক বলল, "ঘুম পেয়ে গেছিল। এখনো ঘুম পেয়ে গেছে। রাখি এখন?"

সুনয়না বলল, "শোন না, দেখো তুমিই বলেছিলে ব্যাপারটা থেকে দুজনেরই বেরিয়ে যাওয়া ভাল। এখন আবার..."

সার্থক বলল, "এক কথা বার বার বলবে না। বলার কোন প্রয়োজন নেই। আমি কিছু বলি নি, কিছু মনেও করি নি। তুমি যা করেছো, একবারে ঠিক করেছো"।

সুনয়না বলল, "বাড়ি থেকে খুব চাপ আসছিল"।

সার্থক একটু চুপ করে থেকে বলল, "ব্যাপারটা ব্রেক আপ হবার আগেই শুরু হয়েছিল, না? তারপরে অফিশিয়ালি কাল দেখতে এসেছে"।

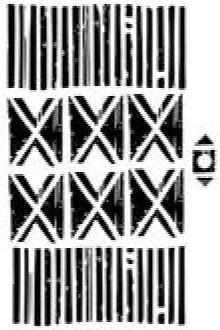
সুনয়না বলল, "না না, মানে সেরকম কিছু না। তুমি ভুল ভাবছো?"

সার্থক বলল, "তাহলে এতো আনন্দ এল কোত্থেকে? যাক গে, আমাকে কেন খামোখা বোঝাতে যাচ্ছো? আমি জানতাম, একদিন ঠিক তোমার বিয়ে খাবো। এটা নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না আমার। এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে সেটা বুঝি নি"।

সুনয়না বলল, “তুমি আমাকে বুঝতে পারছো না”।
সার্থক বলল, “কেউই কাউকে বুঝতে পারে নি। দুজনেই জানতাম এসব চলবে না। যা হয়েছে, ঠিকই হয়েছে। যাক গে, বাড়িতে আবার আমার নামে কাঠি করে দিও না। টিউশনটা দরকার। টাকাটাই এখন মানুষের থেকে বেশি দরকার। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। তুমি তোমার মত চালিয়ে যাও। ঠিক আছে?”
সুনয়না বলল, “তুমি জানো তো তুমি কথা দিয়ে মানুষ মারতে পারো?”
সার্থক বলল, “মরে যাওয়া মানুষ আবার নতুন করে কীভাবে অন্য কাউকে মারবে? এসব নিয়ে একবারে ভেবো না”।
সুনয়না বলল, “ঠিক আছে”।
সার্থক বলল, “আর কিছু বলবে?”
সুনয়না ইতস্তত করে বলল, “আমার ছবিগুলো ডিলিট করে দেওয়াই ভাল”।
সার্থক বলল, “করে দিয়েছি আগেই। চিন্তার কিছু নেই। আমার এত খারাপ অবস্থা হয় নি বা হবে না যে তোমাকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা নেওয়ার কথা ভাবতে হবে। আরেকটা ব্যাপারও আছে, আমার বিন্দুমাত্র কষ্টও হচ্ছে না। এর মানে হল, হয় আমি আগে থেকে জানতাম তুমি ডিচ করে দেবে, নয় আমি আমি কোন কালে তোমাকে ভালই বাসিনি। এ জন্য সেভাবে ড্যামাজড ফিল হচ্ছে না”।
সুনয়না বলল, “তুমি ভালবাসোনি?”
সার্থক বলল, “না। বাসি নি। বাসলে যে সমস্যা হত, সে সব কিছুই হচ্ছে না। তাই ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবছি না”।
সুনয়না কয়েক সেকেন্ড থমকে গিয়ে বলল, “এটা তুমি আমাকে হার্ট করার জন্য বলছো”।
সার্থক বলল, “কেন ফালতু ঘ্যাতাচ্ছো বল তো? হার্টলেস পাবলিককে হার্ট করা যায় নাকি? যত আজে বাজে কথা”।
সুনয়না বলল, “ফাইন। আমি ভেবেছিলাম তুমি কষ্ট পাচ্ছো, তাই ফোন করেছিলাম। কিন্তু তুমি রীতিমতো আমাকে অ্যাটাক করে যাচ্ছো”।
কথা বলতে বলতেই সার্থক শুনতে পেল ডাইনিং রুম থেকে একটা শব্দ আসছে। সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল অতীন ফ্রিজ খুলে দাঁড়িয়ে আছে।
সুনয়নাকে কোন উত্তর না দিয়ে ফোন কেটে দিল সে।
অতীনকে বলল, “কী রে? মাঝরাতে উঠে কী খুঁজছিস?”
অতীন চমকে উঠল। তার দিকে ফিরে বলল, “তুই ঘুমোস নি?”
সার্থক বলল, “না। ঘুমোই নি। ফ্রিজ খুলে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?”
অতীন বলল, “মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করছে। মিষ্টি নেই মনে হয়। কাল কিনে নিয়ে আসবো”।
সার্থক অবাক হয়ে বলল, “মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করছে এত রাতে? কী হল আবার? সুগার হয়েছে? নাকি অফিসে কোন স্ট্রেস যাচ্ছে?”
অতীন হাত নেড়ে বলল, “সেসব কিছু না। তুই শুয়ে পড়”।
সার্থক বলল, “ঠিক আছে। ঘুমো গিয়ে”।
অতীনের অন্যমনস্ক গলা ভেসে এল, “হু”।

বাইরে হঠাৎ করে বৃষ্টি নেমেছে। কোন আগাম খবর ছিল না। কোত্থেকে মেঘ চলে এসেছিল কে জানে!
টুবলাই অহনাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে।
সে তো এদের মধ্যে কোন দিন ছিলই না।
এটা একটা wrong marriage। এ সম্পর্কে থেকে সে কোন কালে খুশি হয় নি। মেয়ে দেখার সময় ভুল করে অহনাকে পছন্দ হয়ে গেল। ক'দিন কথা হল। বিয়ে হল। বাচ্চা হল। প্রেমটা কোন কালে ছিল না। বিদীপ্তা মাঝে মাঝেই বলে, "কেন আমাদের এত পরে দেখা হল বল তো?"
অতীন জানে না। জীবনটাই নিষ্ঠুর। তার জীবন আরো নিষ্ঠুর। মা যাবার আগে এমন ঘ্যান ঘ্যান করতো, বিয়েটা করতেই হল।
অথচ এখন অহনা মোটা হয়ে যাচ্ছে। হাইপার হয়ে যাচ্ছে। অহনার কোন কিছুই আর ভাল লাগে না আজকাল।
ঘুমনোর আগেও বলে গেল টুবলাইয়ের স্কুলের ফিজ জমা করা বাকি। আরো কত কত খরচের ফিরিস্তি দিয়ে গেল। ঘর চালাতে এত খরচা? এ বাড়িতে বাবার ওটুকু পেনশন ছাড়া সব তাকে দিতে হবে। সে যেন এটিএম মেশিন। রাস্তার এক কোণে পড়ে থাকবে। অথচ টাকা নেওয়ার সময় তাকেই সব থেকে বেশি দরকার পড়বে।
আজকাল একবারও কাছে আসে না। শারীরিক ব্যাপারটা তাদের সম্পর্কে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একটা সম্পর্ক শরীর ছাড়া কী করে থাকে?
ঘুম আসছে না। এ পাশ ও পাশ করতে করতে আবার ফোনটা খুলল সে। বিদীপ্তাকে মেসেজ করল, "ঘুম"?
বিদীপ্তা রিপ্লাই করল, "না। সিরিজ দেখছি। কী খবর তোমার? কিছু ঠিক করলে?"
অতীন লিখল, "করেছি তো"।
বিদীপ্তা লিখল- ফোন করছি।
অতীন উঠে ব্যালকনিতে চলে গেলো। বৃষ্টি একটু কমেছে। চেয়ারটা হালকা ভেজা। ওতেই বসে পড়ল। পরে প্যান্ট পাল্টে নিলেই হবে।
ফোন বাজতেই ধরে বলল, "বল"।
বিদীপ্তা – কী ঠিক করলে সেটা কি এখন জানানো যাবে?
অতীন- আমি অ্যারেঞ্জ করছি। আমাকে সাত দিন সময় দাও। এদের সঙ্গে একটা সেটলমেন্টে চলে আসি। দ্য প্রসেস শুড বি স্মুথ।
বিদীপ্তা- সাত দিন? ওকে। টেক ফিফটিন ডেজ। নো প্রবলেম। কিন্তু আমাকে একটা কঙক্রিট ডিসিশন দিও। লাইফটা শুধু আমাকে নিয়ে তো নয়।
অতীন- তোমার ফ্ল্যাটে জায়গা পাবো?

বিদীপ্তা – হ্যাঁ পাবে। কিন্তু তুমি ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবে, তাইতো? সেটা তো করতে হবে। ওয়াইফের কমপেনসেশনটা দরকার। কিছু করে না যখন।
অতীন- বাবা, ভাইয়ের ব্যাপারটাও আছে।
বিদীপ্তা – ভাইটাকে বসিয়ে খাওয়ানো বন্ধ কর। ছেলেটা যে কমফোর্ট জোনে চলে গেছে, তুমি বুঝতে পারো না? কোন চাপ নেই, দাদা ভাল স্যালারি পায়, দাদার ঘাড় ভেঙে যদি লাইফ কাটিয়ে দেওয়া যায়, জাস্ট এই মাইন্ড সেটে ও চলছে।
অতীন – হু।
বিদীপ্তা- হু না। এবারে একটু সেলফিস হও। তোমার ওয়াইফ, ছেলে বা বাবাকে নিয়ে আমার সত্যিই কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু ভাইয়ের ব্যাপারে ভাবো।
অতীন – ভাবছি। ওকে এখন দরকার। আমি বেরিয়ে গেলে যদ্দিন বাবা বেঁচে আছে, ততদিন ও এদিকটা সামলাতে পারবে।
বিদীপ্তা – কোন যুগে থাকো বল তো? একবারে গাধা তুমি। যাক গে, যা করবে তাড়াতাড়ি কর।
অতীন – আমাদের পাহাড়ে যাবার একটা কথা চলছে। আমরা তিনজনই। সেটা হলে ওকে ওখানে গিয়েই বলব।
বিদীপ্তা- পাহাড়? মানে? সিরিয়াসলি? আবার সেকেন্ড হানিমুনও চাই তোমার? তুমি বুঝতে পারছো তুমি কী বলছো?
অতীন – যেটা বাড়িতে বলা যায় না, সেটা বাইরে বলা যায়। এখানে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়ে আছে, কিছু বলা মানে ঝামেলা হয়ে যেতে পারে।
বিদীপ্তা- পাহাড়ে গেলেও ঝামেলা হবে। টেক মাই অপিনিয়ন।
অতীন – ঠিক আছে। আমি দেখছি। আমাকে সময় দাও।
বিদীপ্তা- বাবা একজনের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল। আমি কাটিয়ে দিয়েছি। স্টেইজ ইন স্টেটস। দেশে ফিরছে বিয়ে করবে বলে। এসব ছেলে মডার্ন হয়। আমার পাস্ট নিয়ে লিস্ট বদার্ড হবে।
অতীন- মানে? ছেলে চলে এল? কবে আসছে?
বিদীপ্তা- নেক্সট ফ্রাইডে। কাটিয়ে দিলেও তুমি না করলে আমি এর সঙ্গেই জুড়ে যাবো ভাবছি। তুমি দেখো, তোমার যদি মনে হয় বাপ বউ ছেলে ভাইকে ছাড়তে পারবে না, প্লিজ টেক ইয়োর ডিসিশন এজ কুইক এজ পসিবল। তুমি তোমার বউকে ছাড়লেও আমি ওর ব্যাপারে কোন দিন কোন ঝামেলা করবো না। আই রেসপেক্ট দ্যাট রিলেশনশিপ। কিন্তু আমি একবারে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে রাধিকা হয়ে থাকতে পারবো না অতীন।
অতীন বলল, “ঠিক আছে, আমি দেখছি কী করা যায়”।
ফোন রেখে ঘরে ফিরতে গিয়ে অতীন ভূত দেখার মত চমকে উঠল। দরজায় অহনা দাঁড়িয়ে আছে।
সে বলল, “কখন এলে?”
অহনা বলল, “এলাম। তাহলে বলে ফেলো, বাড়িতে যেটা বলতে পারছো না, পাহাড়ে গিয়ে বলতে পারবে। এখানেই বলে ফেলো”।
অতীন ঘাবড়ে গেল, “আরে ও সব কিছু না। অফিসের কথা। বস বস”।
অহনা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে ঘরে চলে গেলো।



দিদির বাড়ি সচরাচর আসা হয় না অনীশের। অন্যান্যদিন ভোরে ওঠার অভ্যাসও নেই। এদিন ভোর পাঁচটায় ফোন বাজছে দেখে অবাক হয়ে গেছিল।

দিদির শ্বশুরমশাইয়ের বয়স হয়েছে। খারাপ খবর থাকতে পারে ভেবে ফোন ধরল।

অহনা ঠাণ্ডা গলায় বলল, “এখনই বেরো। আমি বাড়ি ফিরবো। তাড়াতাড়ি আয়”।

অনীশ তাড়াহুড়ো করল। দিদি বলেছে যখন দেরী করা ঠিক হবে না।

পাশের পাড়ার ঘন্টুদের গাড়ির ব্যবসা। ঘন্টুকে ডেকে একটা গাড়ি ম্যানেজ করে বেরোতে পেরেছে ভোর ছ'টা নাগাদ।

ড্রাইভারের নাম পরশ। কথা বলে বলে তার মাথা ব্যথা করে দিয়েছে।

“দাদা, কলকাতায় এখন ফুচকা কত টাকা করে যাচ্ছে? কলকাতায় চপের দাম কি এখানের মতই?”

বিরক্ত লাগলেও অনীশ কিছু বলে নি। দিদি এভাবে ডাকে নি কোন দিন। জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি কে জানে। ঝগড়া হলে তার ভূমিকা কী হবে? বাবা মা মারা যাবার পর দিদির হয়ে কথা বলার জন্য সে ছাড়া আর কেউ নেই। ব্যবসার চাপে দিদির সঙ্গে তেমন যোগাযোগও নেই। কী করবে সেটা ঠিক করতে না পেরে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

ভবেশবাবু গ্রাউন্ড ফ্লোরে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। লিফটের ছেলের আসার কথা। বিল্ডার ফোন করে তাকে বলে দিয়েছিল। লিফটের ছেলেটা অদ্ভুত টাইপের। ও ঠিক করে যাওয়ার পরে প্রতিবার লিফট খারাপ হয়ে যায়। কোথাও একটা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। গন্তব্যে পৌঁছনোর ব্যাপারে বড় লিফটটার বড়ই অনীহা।

অনীশকে দেখে এক গাল হেসে এগিয়ে গেলেন ভবেশবাবু, “লিফটের কোম্পানি থেকে পাঠিয়েছে বুঝি?”

অনীশ অবাক হয়ে বলল, “মানে?”

ভবেশবাবু বললেন, “মানে লিফট ঠিক করতে এসেছেন তো ভাই?”

অনীশ মাথা নাড়ল, “না না। আমি অতীনদার ফ্ল্যাটে যাবো”।

ভবেশবাবু হতাশ হয়ে বললেন, “ওহ, লিফটের লোক না? তাহলে আর কী হল? লিফট নিয়ে যা চলছে ক'দিন, কী আর বলবো? ঠিক আছে, এন্ট্রি করে যান। বড় লিফটে যাবেন না। ছোটটায় উঠবেন কেমন?”

একটা জাবদা খাতায় নাম এন্ট্রি করে লিফটে উঠল অনীশ।

দিদি দরজা খুলল। তৈরি হয়ে আছে।

অতীনদা তাকে দেখে ফ্যাকাসে ভাবে হাসল। সার্থক শেষ রাতের দিকে ঘুমোয়। ওঠে নি। অহনা টুবলাইকে রেডি করে দিয়েছিল। টুবলাই মামাকে দেখে খুব খুশি হল। লাফাতে লাফাতে বলল, “মামা বাড়ি যাবো। কী মজা, আজ পরীক্ষাও দিতে হল না”।

অহনা টুবলাইকে বলল, “কাকাইকে ডেকে নিয়ে আয়”।

টুবলাই সার্থককে তুলে নিয়ে এল।

সার্থক ঘুম থেকে উঠে চোখ মুছতে মুছতে এসে দেখল অহনা শাড়ি পরে তৈরি হয়ে গেছে। সে অবাক হয়ে বলল, "আজকেই দার্জিলিং যাচ্ছো নাকি?"
অহনা বলল, "না। দার্জিলিং আর যাওয়া হল না। অনেক সংসার হল, বাড়ি চলে যাচ্ছি"।
অনীশ অতীনকে দেখল। অতীন অন্য দিকে তাকিয়ে আছে।
সার্থক বলল, "বাড়ি যাবে? ঝগড়া করলে নাকি?"
অহনা বলল, "না। ঝগড়া করার মত কিছু হয় নি। তোমার দাদার অন্য কারো সঙ্গে অ্যাফেয়ার আছে। তার সঙ্গে থাকবে। আমার আর থাকার দরকার নেই"।
সার্থক অবাক হয়ে একবার অনীশ, আরেকবার অতীনের দিকে তাকালো। অতীন কিছু বলল না। সার্থক বলল, "কী রে দাদা, বউদি চলে যাবে? বাবাকে কে দেখবে?"
অহনা বলল, "আয়া রেখে দিও। আমি ছিলাম বিনা পয়সার আয়া। সব জানার পর আর থাকা যায় না। ঝামেলা করে লাভ নেই। তুমি জানো, ওসব করার প্রবৃত্তি আমার নেই। তাই কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। আমি বাংলা সিরিয়ালের চরিত্র নই যে সব জানার পরে থাকবো। যদি কিছু ফেলে যাই, পাঠিয়ে দিও"।
সার্থক বলল, "আমাকে তুমি এখন বলছো? আগে তুলে দিতে পারলে না? এ আবার কী? সব কিছুর শেষে আমি জানতে পারলাম?"
অহনা বলল, "একটা ডিসিশন নিতেই হবে। রাতে যেতে পারলে রাতেই যেতাম। থাকাথাকির প্রশ্ন নেই। ঝগড়া ঝাটির প্রবৃত্তি নেই। তোমার দাদাকে জিজ্ঞেস কর, টুবলাইকে রাখতে পারলে রাখুক"।
অতীন বলল, "না না, নিয়ে যাও। আমার অফিস সামলে ওকে রাখতে পারবো না"।
সার্থক বিস্মিত মুখে চেয়ারের উপর বসে পড়ল। বাবা ও ঘর থেকে চিৎকার শুরু করলেন, "বউমা, চা দিয়ে যাও"।
অহনা ক্লান্ত গলায় বলল, "বাবার চায়ের জন্য একটা কাজের মেয়ে রেখে দিও তোমরা। তাছাড়া আয়া রাখলে ভাল হয়। এখনই আয়া সেন্টারে বলে দাও। সকালে আমি সব পরিষ্কার করে দিয়েছি। বাকি দিনের জন্য লাগবে আর কী"।
সার্থক মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল।
সে কী বলবে বুঝতে পারছিল না।
একমাত্র টুবলাই কিছু বুঝছে না। মামাবাড়ির যাওয়ার আনন্দে সে মশগুল। ঘুরে ঘুরে গান করছে আবার। স্কুলে শিখেছে সম্প্রতি।
তার কোন বোঝার দায় নেই। সে দিব্যি আছে...

ঘর ফাঁকা হয়ে যাওয়া মানে একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর অনুভূতি। যে ঘরে একটু আগেও লোকজন ছিল, টুবলাইয়ের পেছনে চিৎকার চ্যাঁচামেচি ছিল, অহনা টুবলাইকে নিয়ে চলে যাবার পর ঘরে শ্মশানের শান্তি নেমে এলো। অতীন একইভাবে বসে ছিল। সার্থক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আমাকে একবার বলতে পারতিস”।
অতীন বলল, “কালকে ওই জন্যই ডেকেছিলাম”।
সার্থক বলল, “এবার কী করবি?”
অতীন বলল, “জানি না”।
সার্থক দাদার দিকে তাকালো। দাদা বরাবরই আগু পিছু কোন কিছু না ভেবে কাজ করে ফেলে। খুব ভাল ছাত্র ছিল বলে বরাবর সব দোষ ঢাকা পড়ে গেছে।
সে বলল, “কার সঙ্গে জড়িয়েছিস? আমরা চিনি?”
অতীন বলল, “আছে একজন। তুই চিনবি না”।
সার্থক বলল, “বউদি চাকরি করে না। টুবলাই। ওর পড়াশুনোর পেছনে তো অনেক খরচ হবে?”
অতীন বলল, “সেটা ভেবেছি। সবটা আমিই দেবো। ভেবেছিলাম তোদের বলে আমি আলাদা হয়ে যাবো। তার আগেই অহনা সব জেনে গেল। এটাই সমস্যা। সামনা সামনে বসে কথা বলে নিলে সব ঠিক হয়ে যেতো”।
বাবা পাশের ঘর থেকে বউমা বউমা বলে ডাকতে শুরু করলো।
অতীন বলল, “তুই আয়া সেন্টারে কন্ট্যাক্ট কর। ওরা কাউকে পাঠাক। আমাকে অফিসে যেতে হবে। তোর টিউশন পড়ানো নেই?”
সার্থক বলল, “হ্যাঁ আছে, একটু পরেই বেরোতে হবে। রান্না বান্নার কী হবে? এখনই মাসী পাবো কোথায়?”
অতীন বলল, “আনিয়ে নে। বাবাকে নিয়েই চিন্তা। বাবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বৃদ্ধাশ্রমগুলো কেমন হয় জানিস? ওখানে আয়া পাওয়া যায়?”
সার্থক হাঁ করে অতীনের দিকে তাকালো।
অতীন বিরক্ত মুখে বলল, “র‍্যাশনালি ভাব। ইমোশনের কিছু নেই। বাড়িতে কেউ থাকবে না। বাবাকে কোন আয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে সমস্যা আরো বেশি হবে”।
সার্থক বলল, “সকালে উঠে এখনো বাথরুম যেতে পারলাম না। এর মধ্যে একটার পর একটা ডিসিশন চলে আসছে মিসাইলের মত যার বেশিরভাগই আমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। আমি তো বুঝতেই পারছি না কী ভাবতে হবে। তুই সব ভেবে রেখে দিয়েছিস?”
অতীন বিরক্ত গলায় বলল, “আমার তো সেটাই কাজ। ম্যানেজেরিয়াল পোস্টে থাকলে ডিসিশন মেকিং করতে হয় এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এই মুহূর্তে যে ক্রাইসিসটা তৈরি হয়েছে, তার জন্য বাবার

একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তুই তো আর অহনার মত বাবার হাগা মোতা ধরবি না। আমিও ধরবো না। তাহলে যেটা করতে হবে, সেটা করাই ভাল, তাই না"?

কলিং বেল বাজল।

সার্থক উঠে দরজা খুলে দেখল মিসেস সেন দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। ভদ্রমহিলা ফ্ল্যাটের পি এন পি সি কমিটির সি ই ও। এখনই জেরা শুরু হবে। বলল, "হ্যাঁ মাসীমা বলুন"।

মিসেস সেন বললেন, "কী ব্যাপার বল তো? অহনাকে দেখলাম চলে যেতে! টুবুবাবার পরীক্ষা চলছে না এখন? কোথায় গেল?"

সার্থক কয়েক সেকেন্ড মিসেস সেনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "চলে গেছে"।

মিসেস সেন গালে হাত দিয়ে বললেন, "সেটাই তো জানতে চাইছি। কোথায় গেলো?"

সার্থক বলল, "বাপের বাড়ি চলে গেছে। ডিভোর্স হয়ে যাবে। দাদার এক্সট্রা ম্যারিটাল ছিল। জানতে পেরে গেছে"।

মিসেস সেন তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "তুমি জানো আমি তোমার থেকে কত বড়? আমাকে তোমার ইয়ার্কির পাত্রী মনে হয়?"

সার্থক বলল, "সত্যি বলছি মাসীমা"।

মিসেস সেন দাপাতে দাপাতে চলে গেলেন।

অতীন হতভম্ব হয়ে গেছিল।

সার্থক দরজা বন্ধ করতেই বলল, "তোর কী মাথা খারাপ? একে সব বলে দিলি?"

সার্থক বলল, "একদিন না একদিন জানতেই পারবে। এখন বিশ্বাস করছে না। পরে যখন জানতে পারবে তখন বলবে কেন এখন মিথ্যে বলেছিলাম। তাই সত্যিটা বলে দিলাম"।

অতীন মাথা নাড়ল, "কী যে করিস না"!

সার্থক বলল, "এটা আমার বলা উচিত ছিল তোকে। আমার বলতে হতো। ঘুম থেকে উঠে জানতে পারছি এসব করেছিস। বউদি চলে গেলো বাবার কী হবে?"

অতীন বলল, "তুই আয়া সেন্টারে ফোন কর। একটা আয়া এলে তারপর বেরবো। আমি অফিসে ফোন করে দিচ্ছি। পরে যাবো। আজকের দিনটা ম্যানেজ করে নেবো"।

সার্থক বলল, "চিনি না জানি না এমন কারো হাতে ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবো? আমাকেও তো বেরোতে হবে"।

অতীন বলল, "এই জন্যই তো বৃদ্ধাশ্রম বললাম। বাবাকে আজকেই ডেসপ্যাচ করার ব্যবস্থা করতে হবে। উফ!"

অতীন চিন্তিত মুখে বসে রইল।

টুবলাই গাড়ির মধ্যে লাফালাফি করছিল। অহনা টুবলাইকে সামলাচ্ছিল।
অনীশ বলল, “দুপুরে বাইরে খেয়ে ঢুকতে হবে। কাল থেকে বাজার করে দেবো। রাতেও খাবার আনিয়ে নেওয়া যাবে”।
অহনা বলল, “তুই কি রোজ বাইরে খাচ্ছিস নাকি?”
অনীশ বলল, “হ্যাঁ। বেশ কয়েকটা কাজ চলছে এখন। বাইরে বাইরেই সারাদিন কেটে যাচ্ছে। ঘর সামলানোর সময় কোথায়?”
অহনা বলল, “বলিস নি তো?”
অনীশ বলল, “জানতে চেয়েছিস কোনদিন? টুবলাই হবার পর থেকে সারাক্ষণ সংসার সংসার করে মরলি”।
অহনা বলল, “হু”।
পরশ বলল, “খাসীর ঝোলে ফ্রাই করা তড়কা খাবেন দাদা? ঘোষের হোটেলে করে। হেবি রাঁধে”।
অনীশ কিছু বলার আগে অহনাই বলল, “হ্যাঁ হ্যাঁ। খাবো। দাঁড়িয়ে যেও”।
যশোর রোডের পরশ একটা ধাবায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, “এই দোকানে দারুণ রান্না করে। খেয়ে দেখুন”।
টুবলাই বলল, “মা, চিপস খাবো”।
অনীশ টুবলাইকে কোলে নিলো, “চল, তুই কী খাবি, কিনে ফেলি”।
অহনা বলল, “যা চাইবে তাই দিবি না। ছোট চিপস দে, বেশি খেয়ে বমি করতে শুরু করবে, সামলানো যাবে না। ডাক্তার জ্যেঠু বকবে তখন”।
অনীশ বলল, “ঠিক আছে, তুই গিয়ে বস। আমি চিপস নিয়ে যাচ্ছি”।
তুমুল ঝাল তড়কা। কিন্তু খেতে সত্যিই ভাল। রুটি আর পেঁয়াজ দিয়ে খেতে অসাধারণ লাগছে।
চোখের জলে নাকের জলে হতে হতে খাচ্ছিল অহনা। অনীশের অবাক লাগছিল। অহনার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। এভাবে একটা সংসারে এতদিন থাকার পর তার দিদিটা এত আবেগহীন হয়ে গেলো কী করে?
খেতে খেতে অহনা বলল, “বুড়িপিসিকে আমার ঘরটা পরিষ্কার করে রাখতে বল। কী করে রেখেছে কে জানে। চিন্তাটা টুবলাইয়ের স্কুল নিয়ে। কলকাতা থেকে টি সি নিয়ে আসতে হবে। একটা বছর চলে গেল”।
অনীশ বলল, “ওসব নিয়ে ভাবিস না। আমি দেখছি কী করা যায়। আমারও কিছু চেনা জানা হয়েছে”।
অহনা অবাক হয়ে বলল, “তোর আবার কী চেনা জানা আছে? তুই তো লোকের সঙ্গে কথা বলতেই ভয় পাস। কিছু হলেই বলবি দিদি তুই বল। আমি বলব না। তোর চেনা জানা আছে? কী যে বলিস”।
অনীশ হাসতে হাসতে বলল, “তুই কি এখনো আমাকে সেই ছোটই ভাবিস? বড় হয়েছি যে ভুলে গেছিস নাকি?”

অহনা বলল, "কী বড় হয়েছিস কে জানে। বাড়ির হাল কী করে রেখেছিস গিয়ে দেখবো। ঝাঁটা নিয়ে নামতে হবে"।
অনীশ বলল, "তুই দুটো দিন রেস্ট কর আগে। সারাক্ষণ কাজ কাজ কাজ করিস না"।
অহনা বলল, "রেস্টই তো হয়ে গেলো। আর কী?"
অনীশ বলল, "ঠিক আছে। মন খারাপ করিস না"।
অহনা বলল, "মন খারাপের কিছু নেই। একদিকে ভালোই হয়েছে। আমার অজান্তে লুকিয়ে কিছু করে যাচ্ছে, আরো পরে জানতে পারলে ছেলেটার উপরে বাজে প্রভাব পড়ত। যা হয়েছে, বেশ হয়েছে"।
টুবলাই বাড়ি থাকলে ঝাল খেতে পারে না। এদিকে সাগ্রহে তড়কা খাচ্ছিল। অহনা বলল, "দেখেছিস? এরপর রাতে তরকারিতে একটু ঝাল দিলে বলবে মা খাবো না। বাইরের সব খাবার ভালো"।
অহনার ফোন বাজছিল। অহনা দেখল সার্থক ফোন করছে। ধরল, "বল"।
"পৌঁছে গেছো তোমরা?"
"হ্যাঁ রাস্তায় আছি"।
"ঠিক আছে, পৌঁছে খবর দিও"।
"দেবো"।
"আমি না ঠিক বুঝতে পারছি না কী করবো। আমার মাথা কাজ করছে না"।
"দুটো দিন যাক। বুঝে যাবে কী করতে হবে। সাবধানে থেকো, বাইরের খাওয়া দাওয়া বেশি কোর না"।
"আর বাইরের খাওয়া দাওয়া। বাবাকেই তো বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর প্ল্যান করে ফেলল এর মধ্যে"। শ্বাস ছাড়ল সার্থক।
ফোনটা কয়েক সেকেন্ড ধরে থেকে অহনা বলল, "ও। দেখো আর কী কী করে"।
"ঠিকই। দেখি আর কী কী হয়। ফ্ল্যাটটা পুরো ফাঁকা হয়ে গেলো। খা খা করছে এখন। ভাল্লাগছে না একবারে"।
"হু। পড়াতে যাও। কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়। আর কী বলব?"
"সেই। তুমি আর কী বলবে? আমিই যে কী বলবো তাই তো বুঝতে পারছি না। কাল নাকি পাড়ার মোড়ে আমাকে ডেকেছিল এই কথা নিয়ে আলোচনা করবে বলেই। তারপর আর বলে নি কিছু। ভয় পাচ্ছিল বোধ হয়"।
"ভাগ্যিস দার্জিলিঙে নিয়ে গিয়ে বলে নি। ওখান থেকে টুবলাইকে নিয়ে ফেরাটা কঠিন হয়ে যেতো। যাক গে, ভাল থেকো। রাখি"।
ফোনটা কেটে দিল অহনা। এক ফোঁটা চোখের জল বেরোয় নি তার ও বাড়ি থেকে বেরোনোর পর থেকে। হাত মুখ ধুয়ে আবার গাড়িতে গিয়ে বসল।
অনীশ বলল, "পরিতোষ পালিত এখনো বিয়ে করে নি জানিস। সেই বুড়োটা"।
অহনা বলল, "তুই হঠাৎ পরিতোষ পালিতের কথা বললি কেন? কী হল? তোর কী ধারণা আমি এখন ওই বুড়োকে বিয়ে করবো? এতটা বোঝা হয়ে গেলাম এর মধ্যেই?"
অনীশ ঘাবড়ে গেল, "তোর আবার কী হল? আমি তো এমনিই বললাম। সকালে আসার সময়েও দেখলাম"।
অহনা বলল, "আমায় এসব লোকের নাম বলবি না। শুনলেই মাথা গরম হয়ে যায়। বুড়ো ধাড়ি একটা। ভাবে টাকা দিয়ে লোককে কিনে নেওয়া যায়। সব এক রকম"।
অনীশ বলল, "তুই ওকে যে চোখে দেখিস, আমিও সেই চোখেই দেখি। আমি এমনি বললাম তোকে। তুই অনেক দূর ভেবে ফেললি"।
অহনা বলল, "বললাম তো এসব লোকের কথা উচ্চারণও করবি না। বিরক্তি ধরিয়ে দিলি হঠাৎ করে"।

অনীশ বলল, “ঠিক আছে। মাথা ঠাণ্ডা কর”।
অহনা গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

অফিস যাওয়ার পথে অতীন সচরাচর কাউকে ফোন করে না। একবার রাস্তায় ফোন করতে গিয়ে একটা ছোট অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল সে। তারপর অহনা বলেছিল গাড়ি চালানোর সময় সে যেন কাউকে ফোন না করে। হ্যান্ডস ফ্রিতেও কারো সঙ্গে কথা বলে না সে।

এদিন অফিসের জন্য বেরিয়ে গাড়িতে উঠে তার মনে হল অহনার কথা শোনার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। যে থাকে, তার কথাগুলো অনেকটা নির্দেশের মত শোনায়। সে যখন চলে যায়, কোন কোন অভ্যাস না চাইতেও থেকে যায়। সচেতনভাবে সেগুলো না শোনার চেষ্টা করতে হবে ভেবেই সে বিদীপ্তাকে ফোন করল।

বিদীপ্তা ফোন ধরল, "বল"।

অতীন আনন্দিত গলায় বলল, "একটা আপডেট আছে"।

বিদীপ্তা বলল, "কী সেটা?"

অতীন বলল, "তোমার মনে হয় স্টেটসে যাওয়া হল না"।

বিদীপ্তা অবাক গলায় বলল, "মানে?"

অতীন বলল, "অহনা চলে গেছে। স্মুদ অপারেশন হয়েছে, কিন্তু বিন্দুমাত্র রক্তপাত হয় নি। কাল তোমার সঙ্গে কথা বলার সময়ে সব শুনে নিজে থেকেই চলে গেছে। কোন ঝামেলাও করে নি"।

বিদীপ্তা উত্তর দিল না।

অতীন বলল, "হ্যালো, হ্যালো। উফ, লাইনে যে কী প্রবলেম হচ্ছে!"

বিদীপ্তা বলল, "বল। বলে যাও। আমি শুনছি"।

অতীন বলল, "আবার কী হল? বললাম তো যা বলার। এরপর তো তোমার আর চিন্তা হবার কথা না"।

বিদীপ্তা বলল, "হু। কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাটি কিছুই হয় নি?"

অতীন বলল, "না। কিচ্ছু হয় নি। টুবলাইকে নিয়ে চলে গেলো। এদিকে একটা বৃদ্ধাশ্রমেও কথা বলে ফেলেছি। বাবাকে ওরা আজকেই নিয়ে যাবে। টাকাটা একটু বেশি দিতে হল, তবে ঝামেলাটা মিটল"।

বিদীপ্তা বলল, "হু। ভাল করেছো"।

অতীন বলল, "এবার? এবার তো আমরা এক সঙ্গে থাকতে পারি। তাই তো?"

বিদীপ্তা বলল, "হ্যাঁ পারি, তবে এখনই এতো তাড়াহুড়োর কিছু নেই। প্রপার ওয়েতে ডিভোর্স হোক। আশা করি ব্যাপারটা মিউচুয়ালি মিটে যাবে। তারপর আমাদের বাড়ির ইনভলভমেন্টটাও থাকুক। যা হবে, ভাল করে হোক"।

অতীন হতাশ গলায় বলল, "ডিভোর্সের জন্য ওয়েট করতে হবে একসঙ্গে থাকতে গেলে? সেটা কেন? তুমি তো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেয়ে।"

বিদীপ্তা বলল, "এটা তো আর বাংলা সিরিয়াল না, এখানে সব কিছু প্রপার ওয়েতে হওয়া দরকার। আমাদের বিয়ের ক্ষেত্রেও নিয়ম মেনেই হোক। রেজিস্ট্রি করতে হবে তো। আর তোমার ফ্ল্যাটের কাগজ তোমার নামেই আছে তো?"
অতীন বলল, "না। ওটা অহনার নামে আছে"।
বিদীপ্তা বলল, "তাহলে তো ওটা তোমার বউয়ের নামেই হল"।
অতীন বলল, "ও নিয়ে ভেবো না। একটু সেন্টু মারলেই লিখে দেবে। ইমোশনাল ফুল পুরো, আমাকে একটু সময় দাও, সেটাও বের করে নেওয়া যাবে"।
বিদীপ্তা বলল, "ভাল তো। একটা ব্যাপার, এদ্দিন যার সঙ্গে সংসার করলে, তাকেই ঠকানোর কথা ভাবছো। আমার সঙ্গে থাকার পর আমাকে ঠকিয়ে আবার এসব প্ল্যান করবে না তো? অবশ্য লাভ হবে না, আমার ফ্ল্যাট আমি তোমার নামে কখনোই লিখে দেবো না"।
অতীন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "এই না না। এভাবে বলছো কেন? আমি কেন তোমাকে ঠকাতে যাবো? আমি বরাবর তোমাকেই ভালবেসেছি। অহনা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। দেখো, চলে গেছে যখন, তখন আর চিন্তা কীসের?"
বিদীপ্তা বলল, "উইদাউট সেটলমেন্ট চলে গেছে সোনা। তুমি নিজে থেকে কিছু কর নি। যা হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টলি হয়েছে। যদি তুমি সব কিছু করতে, তাহলে বুঝতাম। ঠিক আছে, এখনই বেশি উচ্ছ্বাস দেখাবো না। দেখা যাক, তুমি কীভাবে সব কিছু সামলাও"।
অতীন বলল, "আমাদের একসঙ্গে থাকার জন্য আমার যা যা করা দরকার, তার সবই করছি আমি। আমরা একসঙ্গে থাকবো, তুমি ভেবো না"।
বিদীপ্তা বলল, "ঠিক আছে। ভাববো না"।
ফোন কাটল অতীন। তার এখন একজন ডিভোর্স ল ইয়ারের প্রয়োজন, যে সব কিছু ভালোয় ভালোয় মিটিয়ে দিতে পারবে।
শহরে একটু একটু করে শীত পড়ছে। তাও বেশ গরম লাগছিল তার।
রাতে অহনাকে দেখে বেশ ভয় পেয়ে গেছিল সে। অহনা তখন চুপ করে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কোন প্রতিক্রিয়াই দিল না। অহনা হয়তো বুঝতে পেরেছিল অতীন ভয় পেয়েছে। নাকি ওরও তার সঙ্গে থাকতে আর ভাল লাগছিল না?
হবে কিছু একটা।
খানিকটা যেতেই জ্যামে পড়ে গেল সে। বিরক্ত মুখে গাড়ির ভেতর বসে রইল অতীন।

অহনা ভেবেছিল, তার ঘরটা বোধ হয় অপরিষ্কার হয়ে থাকবে। বাস্তবে দেখা গেল একবারেই তা হয় নি। বরং বেশ পরিষ্কার হয়েই আছে। তবে তার খুঁতখুঁতে মন। ঝাঁটা নিয়ে ঘর দোর পরিষ্কার করতে বসে গেলো। বাড়ির সামনে ছোট একটা মাঠ আছে। ঘরের এক কোণে একটা বল পেয়ে গেল টুবলাই। তাই নিয়ে মাঠটায় খেলতে শুরু করল।

কলকাতা আর তাদের মফস্বলের মধ্যে অনেক পার্থক্য। সারাদিন ফ্ল্যাটের মধ্যে একটার পর একটা কাজ লেগেই থাকে। রাস্তায় কলকাতার মত কেউ দৌড়চ্ছে না। সারাদিন গাড়ির হর্ন শুনতে হয় না।

সকালের দিকে রান্না করে নিলেই হল। মফঃস্বলে শীত আগে পড়ে। তাদের ঘরে আরো বেশি শীত লাগে। ছোটবেলায় মা প্রায়ই বাবাকে বলতো এ বাড়িটা এতো ঠান্ডা কেন? জমিয়ে শীত পড়লে আরো বেশি শীত লাগে।

তবে অহনার শীত ভাল লাগে বলেই এ বাড়ির ঘরগুলো বেশি প্রিয়। বিশেষ করে তার নিজের ঘরটা। ফেব্রুয়ারির দিকে শীত চলে গেলেও ঘরটা ঠাণ্ডা থাকে। শীতকাল হল সবকিছু নিয়ে মজা করার মরসুম।

দুপুরে ছাদে পাটি পেতে বসে কমলালেবু খাওয়া, উইকেন্ডে সবাই মিলে পিকনিকে যাওয়া, গোটা সময়টাই যেন আনন্দের সময়। ফেব্রুয়ারির সময়টা , যখন শীত চলে যায়, সে সময়টা ভীষণ কষ্ট হতো তার। গরম পড়তে শুরু করবে, তার উপরে ঘাম... সেই আবার শীতকালের জন্য সারাবছর ধরে অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

তোমার প্রিয় ঋতু রচনায় স্যার বসন্তকাল শেখালেও পরীক্ষায় শীত লিখে এসেছিল সে। নিজে নিজেই লিখেছিল শীতকাল তার কেন প্রিয়। অদ্ভুতভাবে রচনায় সব থেকে বেশি নাম্বার সেই পেয়েছিল। ওই স্যারের কাছেই সবাই পড়ত। সব ছাত্ররাই বসন্তকাল লিখেছে। একই উপমা, একই ভাষা। পড়তে পড়তে পরীক্ষকের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অহনার লেখা শীতকাল পড়ে তার প্রাণে জল এসেছিল নির্ঘাত।

অনীশ বাড়ি এসে বেরিয়ে গেছে। বলল বিকেলে বাজার করে নিয়ে আসবে। বাবা মার ফটোর সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ বসল অহনা। ওরা বেঁচে থাকলে কী বলতো? “সব সংসারেই অশান্তি থাকে, তাই বলে কি সংসার ছেড়ে চলে আসতে হয়?”

মার নিয়মিত ডায়লগ ছিল এটা।

ভাগ্যিস ওরা বেঁচে নেই। কথাটা ভেবে নিজেই হেসে ফেলল অহনা।

পাশের বাড়িটা দাস জ্যেঠুদের। বিপরীতের বাড়িটা রায়কাকুদের। রায়কাকুর ছেলে বাইরে থেকে। কাকু কাকীমা একা একা বাড়ি আগলে থাকে। বাচ্চারা বড় হয়ে গিয়ে বাইরে চলে গেলে বাবা মার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। অতীনের নিশ্চয়ই সেসব হত না। টুবলাইয়ের সঙ্গে তার দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক। কিছু একটা হাতে করে নিয়ে এলে টুবলাই খুশি হয়, এই অবধিই। অতীন অফিস থেকে আসার পর থেকে ফোন নিয়ে

বসে পড়ত। টুবলাই গেলে ছুতো নাতায় তাড়িয়ে দিতো। ছেলের জন্য অতীনের খুব একটা খারাপ লাগার কথা না।

বাইরের গেটে শব্দ হল। অহনা তড়িঘড়ি বাইরের দরজা খুলল। টুবলাই একা খেলছে। সময় ভাল না।

বাইরে বেরিয়ে অহনা দেখল পাড়ার এক পিসি এসেছে। মনু পিসি। শীতের দুপুরে ছাদে একসময় মনু পিসির সঙ্গে কত আড্ডা মেরেছে সে! মনু পিসি তার থেকে বয়সে অনেক বড়। খুব কম বয়সে বিধবা হয়েছিল। পাড়ার লোকেরা মনু পিসিকে অপয়া বলে। বিধবা বলে অপয়া। অহনা কোন কালে সে সব কথা কানে নেয় নি।

তাকে দেখে মনুপিসি বলল, "তোদের গাড়ি থেকে নামতে দেখেছিলাম তখন। হাতের কাজ সেরে এলাম। কেমন আছিস রে তুই?"

অহনা বলল, "ভাল আছি। তুমি কেমন আছো?"

মনু পিসি বলল, "বুড়ি হয়ে গেলাম রে মা। কত রকম কষ্ট, তার লিস্ট শেষ হবে না"।

অহনা বলল, "চা খাবে?"

মনু পিসি বলল, "নাহ। কষ্ট করতে হবে না। অন্তুর অবস্থা দেখলি? সারাদিন শুধু টাকার পিছনে ছুটে যাচ্ছে। কতবার বলেছি বিয়ে করে নে বাবা, বাড়িটা থাকে, তুই নিজেও ঠিক থাকিস। তা সে আমার কথা শুনলে তো! লায়েক হয়ে গেছে তোর ভাই"।

অহনা বলল, "আমি এসেছি তো। ব্যবস্থা করছি। ভেবো না"।

মনু পিসি বলল, "সে কী রে? অন্তুর বিয়ে নাকি? সেসব তো কিছু জানি না"!

অহনা হেসে ফেলল, "আরে না না। ওরকম কিছু না। আমি বলতে চাইলাম, আমি এখন ব্যবস্থা করবো। দেখি ভাল একটা মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে"।

মনুপিসি বলল, "তাই বল। তা তো করতেই হবে। তোর কী হয়েছে রে মা? চোখ মুখ এরকম শুকনো লাগছে কেন? তুই তো এসময়ে আসিস ও না। জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি?"

অহনা বলল, "ঝগড়া ঠিক না"।

মনুপিসি বলল, "তবে?"

অহনা বলল, "জামাইয়ের আর আমাকে পছন্দ না পিসি। আরেকজনকে পছন্দ। জামাই এখন তার সঙ্গে থাকবে"।

মনুপিসি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই ছেড়ে দিলি? ঝাঁটা মারতে পারলি না?"

অহনা হেসে ফেলল, "ধুস! ঝাঁটা মেরে কিছু হয় নাকি"?

মনুপিসি বলল, "ঝাঁটা মেরেই হয়। পুরুষ মানুষের শরীরের উপর পেত্নীর বাসা হয়। ভাল করে ঝাড়লে সব পেত্নী পালায়। চেষ্টা করে দেখতে পারতিস"।

অহনা বলল, "দরকার নেই। সে ভাল করে সংসার করুক। আমি মন দিয়ে আমার ছেলেটাকে মানুষ করি"।

মনুপিসি তার দিকে তাকিয়ে বলল, "অধিকার কি এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হয় রে বোকা মেয়ে? অধিকারের জন্য লড়াই করতে হয়"।

অহনা বলল, "ধুস। ওই তো একটা ফ্ল্যাট, আর সে ফ্ল্যাটের মেন্টেনেন্সের জন্য ঝি গিরি। আমি বরং ও বাড়ির অধিকারে ঝাঁটা মারি। ছাড়ো তো"।

মনু পিসি দুঃখী চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাচ্চা নিয়ে একা থাকা খুব কঠিন। দেখ, যদি পারিস"।

বাবাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেলো। যাবার সময় বাবা বেশ কয়েকবার অসহায় ভাবে অহনাকে খুঁজছিলেন। না দেখতে পেয়ে অবাক হয়েছিলেন হয়তো।
সার্থক সে দৃশ্য দেখে আর নিতে পারে নি। ঘরে এসে চুপ করে বসেছিল। ছোটবেলার স্মৃতির আকাশজুড়ে লোকটা আছে। সে স্মৃতি নষ্ট করার দরকার নেই। সে অতীনের জায়গায় থাকলে কী করতো? একই কাজ করতো হয়তো। চাকরি করলে কী করতো?
একই কাজ করতো? সেও কি একটা এক্সট্রা ম্যারিটালে জড়িয়ে পড়তো? বাবাকে পাঠিয়ে দিতে হল আয়াদের ভরসায়! জীবন এতটা নিষ্ঠুর করে দিতে পারে কাউকে?
ফ্ল্যাটটা আরো ফাঁকা হয়ে গেল।
অতীন রাতের দিকে এলো। সার্থককে দরজা খুলে দেখে বলল, "নিয়ে গেছে তো?"
সার্থক বলল, "হু"।
অতীন বাবার ঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে বলল, "ভালোই হল, বল? এখানে থাকলে কী হতো? পড়ে টরে গিয়ে ব্যথা পেতো। আমরা কেউই থাকতে পারতাম না, ভালোই হল। কী বলিস?"
সার্থক বলল, "কথাগুলো কাকে বলছিস? আমাকে না নিজেকে"?
অতীন বলল, "গিল্টি ফিল করানোর চেষ্টা করছিস?"
সার্থক বলল, "কী করছি আমি নিজেই জানি না। আর তুই কী করছিস, সেটা তুই জানলেই ভাল। আবার বিয়ে করছিস কবে?"
অতীন বলল, "ঠিক প্রশ্ন করলি না। আরেকবার প্রশ্নটা কর। বল নিজের ইচ্ছেয় প্রথম বিয়েটা করছিস কবে? আগের বিয়েটা নিজের ইচ্ছেয় তো হয় নি। পরেরটা নিজের ইচ্ছেয় হবে"।
সার্থক বলল, "ভাল। করে ফেল"।
অতীন বিরক্ত হয়ে সার্থকের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই কী বোঝাতে চাইছিস? আমি ভুল করেছি?"
সার্থক বলল, "তুই রাতটা ফ্ল্যাটে থাক। একাই থাক। আমি রাঙা পিসির বাড়ি গেলাম। থেকে দেখ কেমন লাগছে। তারপর নিজেই বলিস ঠিক করেছিস না ভুল করেছিস"।
অতীন বলল, "ওরকম মনে হয়। বিদীপ্তা চলে এলেই দেখবি আবার সব আগের মত হয়ে যাবে। আর তুই রাঙা পিসির বাড়ি গিয়ে কী করবি? থাক, রাতে বিরিয়ানি আনাই। বিরিয়ানি ভালবাসিস তো। আনিয়ে নিচ্ছি। আর কী খাবি বল?"
সার্থক বলল, "বিরিয়ানি আমি ভালবাসি না। টুবলাই বিরিয়ানি ভালবাসে। ভুলে গেছিস মনে হয়"।
অতীন বলল, "ওকে নিয়ে ভাবছিস কেন? ওর পড়াশুনার খরচ তো আমিই চালাবো। সব আমি দেবো। ওকে নিয়ে ভাবার কোন কারণ নেই"।

সার্থক বলল, “ঠিক আছে। রাঙা পিসিকে ফোন করে দিয়েছিলাম। এখন না গেলে আবার বাজে ব্যাপার হবে। কাল চলে আসবো। বেরোলাম”।

অতীন কিছু বলল না। সার্থক বেরিয়ে গেল।

দরজা বন্ধ হতে অতীন বিরক্ত গলায় বলল, “যত্তসব সস্তা সেন্টিমেন্ট। ভাল হয়েছে, অনেকদিন হুইস্কি খাই না। আজ আনিয়ে নিয়ে সেলিব্রেট করি। অহনার ন্যাকামি আর সহ্য করতে হবে না। টুবলাইয়ের সামনে খেও না, ব্যাড এফেক্ট পড়বে। হে হে, যত্তসব মিডল ক্লাস চিপ কনজারভেটিভ মেন্টালিটি”। সোফায় বসে অতীন একটার জায়গায় চার পাঁচটা বড় বড় বোতল অর্ডার করে দিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বোতলগুলো হোম ডেলিভারি দিয়ে গেলো।

একটা বোতল খোলার সময় তার খেয়াল হল সোফার উপরে টুবলাইয়ের একটা খেলনা গাড়ি পড়ে আছে। নিতে ভুলে গেছে। ঘরে থাকলে এতক্ষণে গাড়িটা নিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতো।

অতীন কিছুক্ষণ গাড়িটা হাতে নিয়ে আবার আগের জায়গায় রেখে দিল। টুবলাই থাকলে এই গাড়িটা তার হাতে দেখলেই চেঁচিয়ে ফ্ল্যাট মাথায় করতো। ছোটবেলায় অতীনের খেলনাও অন্য কেউ নিলে সে চিৎকার শুরু করে দিতো। অবশ্য তখন অনেক খেলনা ছিল না। তারা একবারে নিম্ন মধ্যবিত্ত ছিল। এর মধ্যেই বাবা তার জন্য খেলনা এনে দিতো।

বাবার চশমাটা নিয়ে গেছে? যখন সজ্ঞানে থাকে, খবরের কাগজ পড়ার চেষ্টা করে তো। চশমাটা দেখার জন্য আরেকবার বাবার ঘরে গেলো সে।

নেয় নি। অতীন বলল, “জানতাম এটা ভাই দেখবে না। সেই আমাকেই দেখতে হবে”।

খাটের উপর বিছানার চাদর অবিন্যস্ত। তখন তাড়াহুড়োয় ঘুরে গেছিল। এবার ওই খাটেই বসল সে। অফিস থেকে ফেরার পর তাকে দেখে চিনতে পারলে বাবা বড় করে হাসত।

নিজের মনেই অতীন বলল, “কী সব চিপ সেন্টিমেন্টস! ধুস! নাহ, বিদীপ্তাকে ফোন করি”।

সফল দাদার ব্যর্থ ভাই হবার অনেক বেশি বোঝা বইতে হয়। তার উপরে যদি নিজের চাকরি বাকরি না থাকে। এই মুহূর্তে হয়তো তার দাদার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার সে অর্থ বল নেই। নিজেকে এত অসহায় কখনো মনে হয় নি তার।

অনেকটা রাস্তা একা একা হাঁটল সে। তার মধ্যে একবার সুনয়নার ফোনও এলো। ধরল না। বিচ্ছেদের পর সুনয়নার সঙ্গে কী কথা বলবে? কিছু তো বলার নেই। অকারণ কোন কিছুকে টেনে নিয়ে যাবার কোন মানে হয় না।

থাক , আর কথা বলবে না ওর সঙ্গে।

খানিকটা ঘোরের মধ্যেই যেন সে রাঙা পিসির বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো।

ছোটবেলায় যখন দাদার সঙ্গে এ বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াত, কী আনন্দ হত! এই কাঠের দরজাটা দেখলে স্মৃতিগুলো জেগে ওঠে। সামনে এসে যেন পুরনো কথাগুলো আবার মনে করিয়ে দেয়।

রাঙা পিসি তাকে দেখে খুব খুশি হল, “আয় আয়। কতদিন পর এলি। খবর নেই, কিছু নেই। কী হল বল তো? হঠাৎ কী মনে করে এলি?”

সার্থক বলল, “হয়েছে কিছু একটা। খেতে দাও কিছু”।

রাঙা পিসি বলল, “হাত ধুয়ে টেবিলে বসে যা। ভাত বাড়ছি”।

রাঙা পিসে দু বছর আগে মারা গেছেন। দাদা পুনেতে থাকে। দাদা পুনে যাবার পর থেকে পিসি একাই থাকে।

খেতে বসে সার্থক বুঝতে পারল তার আসলে প্রবল খিদে পেয়েছিল। অনেকখানি ভাত খেয়ে নিল সে। ডাল, বেগুন ভাজা, মাছের ঝোল আর চাটনি। রাঙা পিসির হাতের গুণে সে রান্নাই স্বর্গসম মনে হচ্ছিল।

খেয়ে উঠে বলল, “পান দাও। ভাল করে একখান পান সেজে দাও দিকি”।

রাঙা পিসি গালে হাত দিয়ে বলল, “সে কী রে! তুই পান খাস কবে থেকে?”

সার্থক বলল, “খাই না। এখন খেতে ইচ্ছে করছে। সারাক্ষণই তো চিবোচ্ছো। দাও তো একখান। মিঠা পাতি”।

রাঙা পিসি যত্ন করে পান সেজে দিল। পান মুখে নিয়ে সার্থক বলল, “এবার বলি। খাবার সময় বললে তো ঠিক করে বলা যেতো না। এবার বলা যায়। আমার দাদা দেশের নেতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। বউদি বাপের বাড়ি চলে গেছে। ডিভোর্স হয়ে যাবে। আর নতুন বউদি এন্ট্রি নেবে শিগগিরি”।

রাঙা পিসি হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “এত কিছু ঘটে গেলো, আর তুই আমাকে এখন বলছিস এগুলো?”

সার্থক বলল, “এত কিছু ঘটেছে বটে, তবে সব কিছু আজকেই ঘটেছে। সকাল থেকে ঝড়ের মত ঘটছে সব। তোমার দাদাকে বৃদ্ধাশ্রমেও পাঠানো হয়ে গেছে”।

রাঙা পিসি সবটা শুনে কাঁদতে শুরু করল, “তোরা এতো পাষণ্ড? আমার দাদাটাকে ওই অবস্থায় বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিলি?”
সার্থক বলল, “ভেবে দেখলাম, বাজে শোনালেও বাবার জন্য এই সিদ্ধান্তটা খুব একটা খারাপ হবে না। আজকাল বাইরের আয়ার উপর ভরসা কি করা যায়? যদি বাবা পড়ে যেতো? আমি তো সব সময় থাকতে পারবো না। বৃদ্ধাশ্রমে অন্তত কেউ না কেউ দেখবে। লোকের চোখের সামনে থাকবে”।
রাঙা পিসি বলল, “লোকটা সংসারের বোঝা হয়ে গেলো? আর অতীন এসব কী শুরু করল? ছি ছি ছি। নিজের ছেলেটার মুখ চেয়ে অন্তত এসব করার থেকে নিজেকে আটকে রাখতে পারতো”।
সার্থক বলল, “এগুলো তো লোকে ঘোরের মধ্যে করে। দাদাকে দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কোনো ঘোরের মধ্যে থেকে এসব করছে”।
রাঙা পিসি বলল, “তুই ফোন করে আমাকে দে তো। আমি কথা বলবো”।
সার্থক বলল, “একদম এসব করতে যেও না। তাহলে আবার আমাকে গালাগাল দেবে। যা পারে করুক”।
রাঙা পিসি বলল, “করতে যাবো না? চোখের সামনে সংসারটাকে ভেসে যেতে দেখবো? এভাবে চলতে দেওয়া যায়? বোঝাতে হবে না? আমি না বোঝালে কে বোঝাবে?”
সার্থক শ্বাস ছেড়ে বলল, “তোমাকে এই জন্য বলতে চাইছিলাম না”।
রাঙা পিসি বলল, “দাদাকে দরকার হলে আমি এই বাড়িতে নিয়ে আসবো। আমি বেঁচে থাকতে আমার দাদা বৃদ্ধাশ্রমে থাকবে না। আর তুই অতীনকে ফোন কর। কোন ডাইনির পাল্লায় পড়েছে, আমি দেখবো তাকে। এত বড় সাহস, সংসার ভাঙতে চায়”!
সার্থক বলল, “ও তুমি আর জোড়া লাগাতে পারবে না। বউদি আর ফিরবে না। আমি বউদিকে খুব ভালোভাবে চিনি। ভীষণ জেদি। সবাইকে আগলে রাখতে পারে। আর কোন কিছুর উপর থেকে যদি ওর মনে চলে যায়, সে আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনা যায় না”।
রাঙা পিসি আরো জোরে কাঁদতে শুরু করল।
সার্থক বলল, “কেঁদো না। যা হচ্ছে দেখে যাও। আমাদের তো কিছু করার নেই। চাকরি বাকরির যা অবস্থা, খুব শিগগিরি হয়তো বাইরে চলে যাবো। যাবার আগে জোর করে কোন কিছু আটকানোর চেষ্টা করে তো লাভ নেই”।
রাঙা পিসি বলল, “কালকে অবধি সব ঠিক ছিল আর আজকেই এত কিছু হয়ে গেলো?”
সার্থক বলল, “এই তো জীবন কালীদা। ‘কোথা থেকে কখন যে কী হয়ে গেলো, সাজানো ফুলের বনে ঝড় বয়ে গেলো’”।
পিসি কাঁদতে শুরু করে দিল। পিসির কান্না দেখে সার্থকের চোখও ভিজে উঠল। সে চোখের জল আড়াল করল।

অনীশ রাত আটটায় অনেক কিছু বাজার করে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

অহনা এত বাজার দেখে রেগে গেল, “দেখো কাণ্ড! কত খরচা করে ফেললি? এত কী নিয়ে এলি তুই?”

অনীশ বলল, “কিছুই তো ছিল না। যেগুলো আনার দরকার ছিল, সব নিয়ে এলাম। একদিকে ভালো হয়েছে তুই এলি। ঘরের রান্না খেতে পারবো এখন”।

রোজকার অভ্যাসবশতই টুবলাইকে পড়াতে বসেছিল অহনা। মামাকে দেখে টুবলাই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, অহনা কড়া চোখে তাকানোয় আবার খাতায় লিখতে শুরু করল।

অহনা বাজার রান্নাঘরে নিয়ে গেল। সবজি ধুয়ে ফিরে এসে দেখল টুবলাই অনীশের কাঁধে উঠে বসে আছে। সে কড়া চোখে টুবলাইয়ের দিকে তাকাতে টুবলাই নেমে পড়ল।

অহনা অনীশকে বলল, “তুই কি খুব ব্যস্ত থাকিস এখন?”

অনীশ বলল, “হ্যাঁ। কয়েকটা কাজ চলছে। কেন রে?”

অহনা বলল, “দুপুরে খেয়ে যাবি। আমি এসেছি যখন, বাইরে খেতে হবে না”।

অনীশ বলল, “ঠিক আছে। ওসব নিয়ে ভাবিস না। চলে আসবো সময় পেলে। না আসতে পারলে ফোন করে দেবো। একজনের সঙ্গে টুবলাইয়ের স্কুলের ব্যাপারে কথা হল। এ বছরটা ওই স্কুলে ভর্তি নিয়ে নেবে। পরের বছর ভাল কোন স্কুলে দিয়ে দেবো। তাহলে বছর নষ্ট হবে না”।

অহনা বলল, “ঠিক আছে। কোন স্কুলে?”

অনীশ বলল, “বাজারের পাশে একটা নতুন স্কুল খুলেছে”।

অহনা বলল, “কোত্থেকে কোথায় চলে এলো। ছেলেটা মানাতে পারুক, তাহলেই হবে”।

অনীশ বলল, “পারবে। না পারার কিছু নেই। কোন কান্নাকাটিও তো করছে না। আমি ওকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। চল ভাগ্নে”।

অহনা মৃদু প্রতিবাদ করতে গিয়েও চুপ করে গেলো। অনীশ টুবলাইকে নিয়ে যেতে চাইলে যাক। বাচ্চাটার ঘুরে আসাও দরকার।

অনীশ বেরিয়ে গেলে অহনা রান্নাঘরে গেলো। রাতের জন্য হালকা কিছু রান্না করে নেওয়া যাক। তার রান্না করতে ভাল লাগে। রাঁধতে গিয়ে নিজের সঙ্গে সময় কাটানো যায়।

যে কোন ক্রাইসিসে আসল কাজ হল সবার আগে নিজেকে সামলানো। নিজে ঠিক থাকলেই সব কিছু ঠিক থাকে। নিজে অসুস্থ হয়ে গেলে আর কিছু ঠিক থাকে না। তরকারি করে খাবার টেবিলে রেখে দেখলও সার্থক ফোন করেছিল। মিসড কল দেখাচ্ছে। কল ব্যাক করল সে।

সার্থক বলল, “আমি রাঙা পিসির বাড়ি এসেছি। বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়েছে শোনার পর থেকে রাঙা পিসি খুব কান্নাকাটি করছে”।

অহনা বলল, “কী আর করবে? একটা না একটা ডিসিশন তো নিতেই হতো”।

সার্থক সামান্য ইতস্তত করে বলল, “দাদা তোমাকে ফোন করেছিল?”
অহনা বলল, “না, করে নি। ফোন করার কোন কারণ তো দেখতে পাচ্ছি না”।
সার্থক বলল, “হ্যাঁ, এখন ফোন করবে এমন আশা আমি অন্তত করছি না। আচ্ছা, তুমি কি আগে কিছুই বোঝো নি? ফোন টোন ঘাঁটতে না?”
অহনা বলল, “আশ্চর্য ব্যাপার! কেন ফোন ঘাঁটতে যাবো? তাছাড়া নিজেই তো কতবার বলেছে ফোনে অফিসের কাজ করে, ফোন যেন না ধরি। তোমার সামনেও তো টুবলাইকে বলতো টুবলাই যখন গেমস খেলতে চাইতো তখন। তুমি কি সেসব ভুলে গেছো নাকি?”
সাৰ্হক বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক বলেছো। আমার মনে পড়েছে। ওই সবই করেছে তখন। যাক গে, ফ্ল্যাট খালি আছে। যা পারে করুক। আমি ব্যাঙ্গালোরে চলে যাবো। আর এই পোড়া শহরে থাকবো না”।
অহনা বলল, “তুমি টাকা পাবে কোথায়? যেতে টাকা লাগবে, ওখানে থাকতে টাকা লাগবে, শুরুতে গিয়েই তো তুমি চাকরি পাবে না”।
সার্থক বলল, “দরকার হলে স্টেশনে শোবো, ফুটপাথে শোবো। কিন্তু আমি এখানে আর থাকবো না। ও ফ্ল্যাট আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে”।
অহনা বলল, “ঠিক আছে। যেও। আমার কাছে তো টাকা নেই, তবে আমার হাতের একটা বালা নিলে কিছু টাকা তো পাবে? চাকরি করে নতুন বালা করে দেবে না হয়”।
সার্থক চুপ করে গেলো। অহনা বলল, “যাবে যখন ঠিক করেছো, তখন যাওয়াই ভাল। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার দরকার নেই। সব কিছু ঠিক থাকলে হয়তো বাধা দিতাম, এখন মনে হচ্ছে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা তুমি ঠিকই নিয়েছো”।
সার্থক বলল, “আমারও তাই মনে হয়। টুবলাইকে দেখতে ইচ্ছে করছে বউদি”।
অহনা বলল, “যখন খুশি চলে এসো। না আসতে পারলে ভিডিও কল করে দেখে নিও”।
সার্থক বলল, “আছে এখন?”
অহনা বলল, “ওর মামার সঙ্গে বেরিয়েছে। ফিরলে ফোন করছি। আর সাবধানে থেকো”।
সার্থক বলল, “থাকবো। দেখি আবার রাঙা পিসিকে সামলাই। রাঙা পিসিকে বলাটা ভুল হয়েছে। কাল সকালে বললেই হতো”।
ফোন রাখল অহনা। হোয়াটস অ্যাপে দেখলো, ফ্ল্যাটের গ্রুপে ঝামেলা লেগেছে। রোজকার ঘটনা। সে ফ্ল্যাটের গ্রুপ লিভ করে গেলো। এখন তো আর সে ওই ফ্ল্যাটে থাকে না।
গ্রুপে থেকে আর কী হবে!

অতীন বমি করছে। বেশি হুইস্কি খেয়ে ফেলেছিল।
বাথরুমে বমি করে সেখানেই বসে রইল কিছুক্ষণ। তার সহ্য হয় না বলেই অহনা খেতে দিতো না।
মাথাটা কেমন বন বন করে ঘোরাচ্ছে। কোন মতে দেওয়াল ধরে ধরে ঘরে ঢুকে খাটে বসে এসি চালাল।
ফোন বাজছে। দেখলো বিদীপ্তা ফোন করছে। বিদীপ্তাকে এর আগে ফোন করেছিল সে। বেজে গেছে। বিদীপ্তা ধরে নি। অতীন বোতল খুলে বসে পড়েছিল।
ফোন ধরতে বিদীপ্তা বলল, "কী হল? কতবার ধরে ফোন করে যাচ্ছি, ধরছিলে না কেন? বউ ফিরে এসেছে নাকি?"
অতীন বলল, "বাথরুমে ছিলাম। তোমাকেও তো তখন ফোনে পাই নি"।
বিদীপ্তা বলল, "রান্না করছিলাম। ইউটিউবে একটা রান্না দেখে হঠাৎ করে রাঁধতে ইচ্ছে হল। মেয়েটাকে ছুটি দিয়ে নিজেই রাঁধলাম। তোমার তো আজ রান্নার বালাই নেই। কী খাবে?"
অতীন বলল, "দেখি"।
বিদীপ্তা বলল, "তোমার ভাই কোথায়? মিস্টার লাটসাহেব? ঘরে ঠ্যাং তুলে ঘুমোচ্ছে নাকি? দাদার হোটেলে আছে, ভালই আছে"।
অতীন বলল, "ও নেই তো। পিসির বাড়িতে গেছে"।
বিদীপ্তা বলল, "সেই, তা থাকবে কেন? থাকলে যদি কোন রকমে তোমার কোন হেল্প করে ফেল। অদ্ভুত নিমকহারাম ছেলে একটা"।
অতীন কিছু বলল না।
বিদীপ্তা বলল, "এটাকে সবার আগে তাড়ানো দরকার। আমি কিন্তু অহনা নই। আমি এসব জঞ্জালকে আমার ঘরে রাখবো না"।
অতীন বলল, "তোমার ওই ইউ এস এর ছেলেটার খবর কী?"
বিদীপ্তা বলল, "খবর কী মানে? তুমি আবার ওটা নিয়ে পড়লে কেন? সে সব নিয়ে তো আমি আর ভাবছিই না"।
অতীন বলল, "আরে ভাবা আর কাটানোর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। তুমি কাটাও নি তো। হাতে রেখে দিয়েছো"।
বিদীপ্তা বলল, "উফ! এ আবার কেমন কথা? হাতে রাখার কী আছে? ঠিক আছে, আমি এখনই ফোন করে কাটিয়ে দিচ্ছি। খুশি?"
অতীন বলল, "খুশি। খুশি। খুব খুশি। শোন না, তোমাকে একটা কথা বলি"...
বিদীপ্তা বলল, "এরকম ফিস ফিস করে কথা বলছো কেন? তুমি কি ভাবছো অহনা এখনো ফ্ল্যাটে আছে?"

অতীন হো হো করে হেসে উঠল, "তাই তো! এটা তো ভেবে দেখি নি! ফ্ল্যাট তো এখন ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। আমি এখন মুক্ত! সম্পূর্ণ মুক্ত! উফ কী আরাম! টুবলাইটা কী করছে কে জানে। এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়। কী ব্যাপার জানো, চেনে না ঠিক করে, এদিকে সে নাকি আয়রন ম্যানের ভক্ত। সে কী বায়না। বড় হয়ে সে আয়রন ম্যান হবে। ভাবো! হা হা হা হা। আয়রন ম্যান হবে। ব্যাটার জন্য আয়রন ম্যানের ড্রেস অর্ডার দিয়েছি। পুরো সারপ্রাইজ গিফট। দেখে চমকে যাবে একবারে"।

বিদীপ্তা একটু চুপ করে থেকে বলল, "গিফট অর্ডার দিয়েছো মানে? ওকে গিফট দিতে যাবে নাকি আবার? তোমার শ্বশুরবাড়ি? সেই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুর?"

অতীন বলল, "ও তাই তো। ভুলে যাই টুবলাইও নেই বুঝলে। এগুলো সব হুইস্কির এফেক্ট। এসব নিয়ে চাপ নিও না"।

বিদীপ্তা বলল, "চাপ আমি কোন কিছুই নিচ্ছি না। আমার শুধু মনে হচ্ছে তোমার এখন ও বাড়ি না যাওয়াই ভালো। তোমার বউ ছেলেকে দিয়ে বিভিন্ন রকম ব্ল্যাকমেল করতে পারে"।

অতীন আবার জোরে এসে উঠল, "ধুস, ব্ল্যাকমেল করবে? ওসব কিছু করবে না। ও তো আমাকে ছেড়েই চলে গেলো। ওসব করার থাকলে কখন করে ফেলত। ফোনও করে নি। একবারে লাথ মেরে চলে গেছে। পাত্তাই দেবে না আর। তুমি অহনাকে চেনো নি এখনো। কঠিন মেয়ে"।

বিদীপ্তা বলল, "আর আমি কী? কী মিন করতে চাইছো? আমি চিপ মেয়ে?"

অতীন বলল, "ধুস। আমি তাই বলেছি নাকি? ওসব কিছু না"।

কথা বলতে বলতে অতীনের দুচোখ বেয়ে ঘুম নেমে এলো। হুইস্কি খেলে তার ঘুমও পায়। বেশ কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিদীপ্তা বুঝল অতীন ঘুমিয়ে পড়েছে। সে ফোন কেটে আবার করল। অতীন ধরার মত অবস্থাতেই ছিল না। রাত তিনটের দিকে তার ঘুম ভাঙল। এমন মাথা ধরে আছে, মনে হচ্ছে যে কোন সময় তার মাথা ফেটে বেরিয়ে যাবে।

ডাকল সে, "অনু, এই অনু"।

পরক্ষণে মনে পড়ল অহনারা চলে গেছে। সার্থকও নেই। নিজেই উঠে জলের বোতল নিয়ে অনেকটা জল খেয়ে খাটে এসে বসল অতীন।

তারা তিনজনে যখন শোয়, খাটটা ছোট লাগে। এখন খাটটা বিরাট বড় লাগছে। ভীষণ বড় লাগছে।

নিম্নচাপের সময় যাচ্ছে। কখন যে নিম্নচাপ চলে আসে কেউ জানে না। ঘন কালো মেঘ করে আছে আকাশে। টুবলাই দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়েছে। অহনা চুপ করে শুয়ে আছে। কলকাতা থাকতেও এই সময়টা তার ভীষণ কান্না পেতো কোন কারণ ছাড়াই। কীসের দুঃখ, কীসের কষ্ট জানতো না, শুধু দেখতো বুকটা হুহু করে উঠেছে। অদ্ভুত একটা হাহাকার যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কলকাতার সেই রাত থেকে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নি সে। গত রাতটা জেগেই ছিল। শেষ রাতের দিকে ঘুম এসেছে। মাথায় কোন চিন্তাই আসছে না। টুবলাই যেভাবে তাকে পরম নিশ্চয়তায় জড়িয়ে ধরেছিল, তাতে টুবলাই ছাড়া আর কোন চিন্তা মাথায় আসা সম্ভবও ছিল না। রাতে চোখে জলও আসে নি।

অদ্ভুতভাবে দুপুরবেলায় সেই ভয়াবহ কান্নাটা আসতে চাইছে। নিজেকে ভেঙে চুরে যে কান্নাটা আসে। অহনা প্রবলভাবে সে কান্না আটকে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তার কোন বন্ধু নেই। নেই বলাটা ভুল হবে। ছিল সম্প্রীতি। অদ্ভুতভাবে কোন কারণ ছাড়াই ক্লাস ইলেভেনে সম্প্রীতি একদিন তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। কেন করে দেয়, সে এখনো জানে না। ফেসবুকেও সম্প্রীতি তাকে ব্লক করে দিয়েছিল। সম্প্রীতির বিয়ে হয়ে গেছে। কোথায় হয়েছে জানে না অহনা। সম্প্রীতির প্রোফাইল লোক করা থাকে।

বন্ধু থাকলে হয়তো এই কান্নাটা আসতো না। ও বাড়িতে থাকলেও দুপুরের দিকে একটা অদ্ভুত নিরাপত্তাহীনতা তাকে ঘিরে ধরত। প্রথমে মনে হত, অতীন তাকে ছেড়ে দিলে কী হবে? সে তো চাকরি বাকরি কিছুই করে না। কোথায় যাবে? কী খাবে? টুবলাইকেই বা বড় করবে কী করে?

আশ্চর্যজনকভাবে তার এই আশঙ্কাটা সত্যি হয়ে গেছে। অথচ তার জন্য সে অতোটা ভয় পাচ্ছে না। তাহলে কেন কান্না পাচ্ছে?

নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করল সে।

১) ওই বাড়ি ছেড়ে এসেছে বলে খারাপ লাগছে?

- না। সার্থক আর অতীনের বাবার জন্য খানিকটা খারাপ লাগা আছে, এই যা। তবে তার জন্য কান্না পাবার কোন কারণ নেই।

২) সে কি অতীনকে মিস করছে?

-না।

৩) অতীনের উপর রাগ করেছে?

-একবারেই না।

রাগ করার কোন কারণ নেই। অতীন একজন বড় চাকুরে। হয়তো অতীনের যোগ্য সে ছিল না। অতীন যা ভাল বুঝেছে করেছে এবং বেশ করেছে।

৪) অতীন তাকে ঠকিয়েছে বলে কান্না পাচ্ছে?

-না।
টুবলাই হবার পর অনেকদিন তার সঙ্গে অতীনের শারীরিক সম্পর্ক ছিল না। অতীন যদি সেটাকে অস্ত্র করতে চায়, তাহলে ঠিক আছে। সে যেটা দিতে পারে নি, অন্য কেউ দিতে পেরেছে, সে মেয়েটার জন্য অহনাকে অতীন ছেড়ে দিয়েছে। এর জন্য অতীনকে দোষ দেওয়া উচিত না।
৫) তাহলে কি এই কান্নার বিষয় অতীন না?
-ঠিক তাই। তার কান্নার বিষয় যদি অতীন হত, তাহলে ঠিক এই কান্নাটা ওই ফ্ল্যাটেও আসতো। তা আসে নি যখন, তার মানে হল এই কান্নার বিষয় অতীন না। অন্য কিছু। কোন মানুষ না। এ কান্নার কোন কারণ হয় না। অহেতুক চলে আসে। এই সময়টা ভীষণ অসহায় লাগে।
জানলা খুলে তাদের বাড়ির বাইরের দিকে তাকালো সে। এই জানলাটা ছোটবেলায় তার ভীষণ প্রিয় ছিল। বাবা মা দুজনেই চাকরি করতে চলে যেতো, অহনা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতো। ভাই একটা জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতো, সে একটা জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতো।
এই জানলাটা কত কিছুর সাক্ষী। অতীন তাকে দেখতে এল। এই ঘরে তারা আলাদা করে কথা বলেছিল। এই জানলাটা সেই সময়ের সাক্ষী। সময় কীভাবে ঝড়ের মত চলে যায়। কত বছর অনায়াসে পেরিয়ে গেল, খেয়ালই করলো না কেউ। এভাবেই একদিন সময় পেরোতে পেরোতে কেউ বুড়ো হবে, কেউ বা সময়ের অমোঘ নিয়মে মরে যাবে। এ বাড়িতে বাবা মার মারা যাবার সময়েও এ জানলা ছিল। সে মারা যাবার সময়েও হয়তো থাকবে। নাও থাকতে পারে। বাড়ি রেনোভেট করার কথা বলছিল অনীশ। সেক্ষেত্রে জানলাও পাল্টে যাবে। এত এত সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে কোন মাঠের কোণে পড়ে থাকবে। একটা শালিক সঙ্গী ছাড়া জানলার বাইরে ঘুর ঘুর করছে। স্কুল লাইফে থাকলে মন খারাপ করতো সে। এক শালিখ মানে ভয়াবহ ব্যাপার। এখন দেখেও দেখল না।
অনেকক্ষণ চেষ্টার পর আর পারল না অহনা। হুহু করে কেঁদে ফেলল।
কোন কারণ ছাড়াই। শালিখটা যে অবাক চোখে তাকে দেখতে লাগল...

"তুমি প্লিজ আমাকে ভুল বুঝো না। দেখো, আমরা তো ব্রেক আপ করেই নিয়েছিলাম। আমার কী করার ছিল বল? তুমি আমার উপর রেগে থেকো না প্লিজ"।

সুনয়না মেসেজ করল প্রথমে। তারপর ফোন করল।

সার্থক রাস্তায় হাঁটছিল। ফোন ধরতেই সুনয়না বলল, "তুমি এরকম করছো কেন?"

সার্থক বলল, "আমি কী করলাম?"

সুনয়না বলল, "এই যে তুমি রাগ করছো। আজে বাজে সন্দেহ করছো। আমার কি কিছু করার ছিল?"

সার্থক একটু চুপ করে থেকে বলল, "শোন, তোমাকে একটা কথা বলি। আমার জীবনে তুমিই একমাত্র সমস্যা না। এর থেকে অনেক বড় বড় সমস্যা আছে। তাই দয়া করে একবারেই ভেবে নিও না যে আমি রাগ করেছি। তুমি বিদায় নিয়েছো, নিশ্চিন্তে থাকো। তোমার উপর আমার কোন অধিকার নেই। কিচ্ছু নেই। সুখে থাকো"।

সুনয়না বলল, "কী হয়েছে তোমার? কী সমস্যা?"

সার্থক বলল, "তা জেনে তুমি কী করবে? দয়া করে বিদেয় হও"।

সুনয়না বলল, "এরকম করে কথা বলছো কেন তুমি?"

সার্থক বলল, "আরে অদ্ভুত তো! ব্রেক আপ হয়েছে, তারপর তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে, সামনে তোমার বিয়ে হবে, কর্ণেটো আইসক্রিম হবে, এর মধ্যে আমি কীভাবে কথা বলছি তা কেন ম্যাটার করছে? তুমি নিজের আনন্দে থাকো না! প্লিজ ফোনটা রাখো। আমার ভাল লাগছে না"।

সুনয়না বলল, "খুব খারাপ ভাবে কথা বলছো তুমি"।

সার্থক বলল, "না বলছি না। আমার জায়গায় থাকলে তুমি এর থেকে অনেক বেশি খারাপভাবে কথা বলতে"।

সুনয়না বলল, "কেন? কী হয়েছে? সেটাই তো জানতে চাইছি"।

সার্থক ফোন কেটে দিল। সুনয়না আবার ফোন করতে শুরু করল। সুনয়নার নাম্বারটা ব্লক করে দিল সে। কিছুক্ষণ পর আবার আনব্লক করল। তবে সুনয়না ফোন করলেও ধরল না।

মাথা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। বাবাকে যেখানে নিয়ে গেছে সেখানে একবার ঘুরে আসবে? ঠিক ঠাক দেখভাল হচ্ছে নাকি কে জানে। ভেবে টেবে সেদিকে যাবে বলেই ঠিক করলো। রাঙা পিসি বাবাকে তার কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে। তার আগে অতীনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বৃদ্ধাশ্রমে অনেকগুলো টাকা দিয়ে ফেলেছে অতীন। সে টাকা রিফান্ড হবে নাকি জানতে হবে। রিফান্ড না হলে কী হবে সেটাও জানতে হবে। রাঙা পিসি অনেকবার অতীনকে ফোন করতে চেয়েছিল। সার্থক করতে দেয় নি। রাঙা পিসি অতীনকে কিছু বললে অতীন সার্থকের উপর বিরক্ত হবে। বলে দেবে সে গিয়ে লাগানি ভাঙানি করেছে।

সার্থকের মনে পড়ল অতীন রাতে মেসেজ করেছিল বাবার চশমাটা নিয়ে যাওয়া হয় নি। সেটা মনে পড়ায় আগে ফ্ল্যাটে গিয়ে বাবার চশমাটা নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে যাবে ঠিক করল সে।
বাসে উঠে একটা সিটও পেয়ে গেলো সে। অস্বস্তি হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা থেকে। দাদা যদি তাকে ফ্ল্যাট থেকে বের করে দেয়, তাহলে যাওয়ার জায়গা আপাতত রাঙা পিসির বাড়ি। কিন্তু সেখানে থাকাটা ঠিক হবে না। ব্যাঙ্গালোরই সব থেকে ভাল অপশন বলে মনে হচ্ছে।
বাসে একটা বাচ্চা খুব কথা বলছে। টুবলাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল সার্থকের। টুবলাই স্কুল থেকে এসে তার সঙ্গে খেলতো। শক্ত সম্পর্কগুলো মুহূর্তের মধ্যে কেমন ঠুনকো হয়ে পড়ে।
ভবেশবাবু চেয়ারে পা তুলে ঘুমোচ্ছিলেন। তাকে দেখতেও পেলেন না। বড় লিফটটাতেই উঠল সে। ফ্ল্যাটের চাবি ছিল। দরজা খুলতে গিয়ে দেখতে পেল দরজা লক করা ছিল না। ঘরে ঢুকে দেখল বসার ঘরের অবস্থা ভয়াবহ। টেবিলে মদের বোতল, সিগারেটের ছাই, সোফার উপর মদ পড়ে আছে। অহনা থাকাকালীন এ দৃশ্য ভাবাই যেতো না।
সার্থক অতীনকে ফোন করল।
অতীন ধরে বলল, "কী হল তাড়াতাড়ি বল, মিটিং আছে একটা"।
সার্থক বলল, "তুই ফ্ল্যাট খুলে বেরিয়ে গেছিস? লক করে যাস নি?"
অতীন বলল, "ওহ, তাই না? একদম ভুলে গেছি। সব ঠিক আছে তো?"
সার্থক বলল, "ঠিক আছে? ঘরের অবস্থা কী করে গেছিস?"
অতীন সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে বলল, "এই রাখ রাখ। মিটিং শুরু হবে। ও আমি গিয়ে ঠিক করে দেবো"।
ফোন কেটে গেলো। সার্থক হেসে ফেলল। সমস্যা থেকে এভাবেই বরাবর পালিয়ে এসেছে অতীন। এবারেও ব্যতিক্রম হল না।

"আপনি কি কোন সমস্যায় আছেন?"

অতীনের বস মিস্টার বাগচী অতীনকে ডেকে পাঠিয়েছেন। অতীনকে তার সামনে বসিয়ে প্রশ্ন করলেন।

অতীনের হঠাৎ করে মাথাটা ঘুরে উঠলো। অহনা কি তার অফিসে কিছু বলে দিয়েছে? যদি বলে দেয় তাহলে সে সমস্যায় পড়ে যাবে।

যতটা সম্ভব স্বাভাবিক হয়ে সে বলল, "না তো। কেন স্যার?"

বাগচী বললেন, "লাস্ট কয়েকদিন ধরে আপনি বিকেল সাড়ে চারটের সময় বেরিয়ে যাচ্ছেন। কাজগুলো আটকে আছে, জাজপুরের ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার কথা ছিল আপনার। তাও পোষ্টপন করে দিয়েছেন। কেন? কী হয়েছে?"

অতীন হাঁফ ছাড়লো। যাক, বলে নি তাহলে। বলল, "স্যার, বাড়িতে একটা ছোট সমস্যা চলছে ছেলের এক্সাম নিয়ে। ও জন্যই এসব করেছি"।

বাগচী বললেন, "সামনে একজাম?"

অতীন বলল, "হ্যাঁ স্যার"।

বাগচী বললেন, "ঠিক আছে। কবে পরীক্ষা শেষ হবে?"

অতীন বলল, "সামনেই। চার পাঁচ দিনের মধ্যে"।

বাগচী বললেন, "ফাইন। আপনি তাড়াতাড়ি যেতে পারেন। তবে বাড়িতে বসে একটা কাজ নামিয়ে দিতে হবে। খুব ইম্পরট্যান্ট কাজ। আপনি ছাড়া আর কাউকে ভরসা করতে পারছি না"।

অতীন বলল, "করে দেবো স্যার। কোন সমস্যা নেই"।

বাগচী বললেন, "ওকে। আপনাকে ফাইল শেয়ার করে দিচ্ছি। এই প্রোজেক্টের যা যা বাজেটের এস্টিমেট, তা আপনি করে দেবেন। ছেলেকে পড়িয়ে কিছুটা সময় পাবেন তো? তখন করবেন। ওকে?"

অতীন মাথা নাড়ল, "শিওর স্যার"।

বাগচী বললেন, "আপনার কিন্তু পারফরম্যান্স পড়ছে অতীন। এককালে আপনি কাজের জোরে বাঘ মারতেন। আজকাল বেড়ালও ধরতে পারছেন না। এই কাজটার উপর নেক্সট প্রোমোশান ডিপেন্ড করছে মনে করে করবেন। ওকে?"

অতীন বলল, "শিওর স্যার। আমি করে দেবো"।

বাগচীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে অতীন নিজের চেম্বারে গিয়ে বসবো। আগের প্রোমোশনের সময়েই তার আলাদা চেম্বার হয়েছিল। তার পর থেকেই বিদীপ্তার সঙ্গে সম্পর্কটা শুরু। এই চেম্বারের সঙ্গে বিদীপ্তার সম্পর্কটা বেশ গভীর। জীবনকে নতুন করে দেখতে শিখিয়েছে বিদীপ্তা। মধ্যবিত্ত হয়ে পড়ে থাকলে হবে না, তাকে আরো উঠতে হবে, অহনার সঙ্গে থাকলে এ জন্মে হত না"।

সাড়ে চারটে বলেছিল। এদিন অনেক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বিকেল চারটেতেই অফিস ছাড়ল অতীন। কফিশপে এসে দেখল বিদীপ্তা আগে থেকেই বসে ভিডিও দেখছে। বিদীপ্তার কফিও এসে গেছে।
"তোমার বউ কী ডিমান্ড করছে? কী কী চায় কথা বলে নিয়েছো?"
সে বসতেই কফিতে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল বিদীপ্তা।
অতীন আশে পাশের টেবিলে দেখল। না। কেউ তাদের কথোপকথন শুনছে না। এখানে প্রত্যেক মানুষ নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। অন্য লোকের ব্যাপারে এদের এতো আগ্রহ নেই। এটাই হয়তো ক্লাস ডিফারেন্স। তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাজই হল অন্যদের কথা কান খাড়া করে শোনা।
সে বলল, "এখনো কিছু করে নি। এ নিয়ে কথা হয় নি। ইনফ্যাক্ট কোন কথাই হয় নি এখনও"।
বিদীপ্তা বলল, "খুব পারসোনালিটি দেখাচ্ছে আর কি। হোয়াটেভার, তোমার কি ছেলের জন্য মন খারাপ করছে?"
অতীন বলল, "খানিকটা। সামলে উঠছি"।
বিদীপ্তা অতীনের হাত ধরল। বলল, "হ্যাঁ। মন চাইলে অবশ্যই দেখা করে আসবে। এটা নিয়ে আমি কোনদিন বাধা দেবো না"।
অতীন মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে"।
বিদীপ্তা বলল, "অর্ণব দাস বলে একজন ডিভোর্স ল ইয়ার আছে। নাম্বার পাঠাচ্ছি। কথা বলে নিও। খুব তাড়াতাড়ি সেটলমেন্টটা হওয়া দরকার। আর আমার বাবার সঙ্গে রবিবার দেখা কোর। বাবা তোমাকে দেখতে চেয়েছেন"।
অতীন চমকে উঠল, "বলে দিয়েছো? এখনই?"
বিদীপ্তা বলল, "আর কতদিন না বলে থাকবো? তা ছাড়া ইউ এস এ কে কাটাতে তো বলতেই হতো"।
অতীন খুশি হল, "ওহ, এটা ভুলে গেছিলাম। তাহলে ঠিক আছে। আমি যাবো দেখা করতে"।
বিদীপ্তা বলল, "এক্সপেন্সিভ কোন গিফট নেবে। বাবা কিন্তু একবারে চিপ গিফট পছন্দ করে না"।
অতীন বলল, "শিওর। এটা আবার বলতে?"
বিদীপ্তা বলল, "উইকেন্ড ফ্রি রেখো। পরের উইকেন্ডে আমরা মন্দারমণি ঘুরে আসবো। ওকে?"
অতীন বলল, "ঠিক আছে"।
বিদীপ্তা বলল, "এক্সাইটেড লাগছে। বিয়ের শপিং করবো, প্রি ওয়েডিং করবো, উফ... একটা স্বপ্ন সত্যি হল যেন। আগের বিয়েতে প্রি ওয়েডিং ছিল না নিশ্চয়ই? তখন এসব থাকতো না। এখন কিন্তু যা যা আছে, সব হবে। একটাই আপসোস থাকবে। তোমার দিকের তেমন স্ট্যান্ডার্ড আত্মীয় স্বজন নেই। আমাদের বাড়ির লোকজনেদের আগে থেকে বলে রাখতে হবে। ওরা আবার একটু নাক উঁচু ধরণের"।
অতীন বলল, "হ্যাঁ। আমাদের বাড়ির লোকেরা মধ্যবিত্ত। এসব বাহুল্য বলে মনে করতে পারে। হিংসুটেও। এই যে আমি বড় চাকরি করছি, এরা ভেতরে ভেতরে সব হিংসা করে। এদের না বলাই ভাল। আসার পর দেখা যাবে অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে ফালতু ঝামেলা তৈরি করে দিল"।
বিদীপ্তা বলল, "যে ফ্ল্যাটে আছো, ওটাও তো মিডল ক্লাস লোকেদের। ওসব জায়গায় ফ্ল্যাট রাখার দরকার আছে কি না দেখতে হবে। বেঁচে দেওয়াই ভাল"।
অতীন বলল, "ঠিক আছে। তুমি যা বলবে"।
বিদীপ্তা বলল, "অহনাকে রাজি করিয়ে লিখিয়ে নাও। এক টাকাও তো ই এম আই দেয় না, ওর নামে কেন কিনতে গেলে? এক একটা কাজ কর যার কোন মাথা মুণ্ডু নেই। এমনিতেই তো তুমি ওকে খোরপোষ দেবেই। তার উপরে ফ্ল্যাটটা দেওয়ার তো কিছু নেই। কথা বলে নিতে হবে। না পারলে অর্ণববাবুকে দিয়ে বলাও"।

অতীন বলল, “তখন তো ভাবতে পারি নি জীবনে কোনদিন তুমি আসবে”।
বিদীপ্তা হাসল, “ভাগ্যিস এসেছিলাম। বেঁচে গেলে”।
অতীন বলল, “আমার আত্মীয়স্বজনেরা কখনো যদি কিছু বলে, কথা টথা শোনায়, কিছু মনে কোর না। এরা কুয়োর ব্যাং। এদের সেই ধারণাই নেই যে মডার্ন মানুষ কম্প্যাটিবিলিটি না পেলে একটা সম্পর্ক ছেড়ে অন্য সম্পর্কে যেতে দুবার ভাবে না। দুনিয়া পাল্টে গেলেও এরা সেই মান্ধাতা আমলেই পড়ে আছে”।
বিদীপ্তা বলল, “জানি। এখনকার দিনে বেশিরভাগই তাই। সবটাই সোসাইটির উপর নির্ভর করে। এদের এতো পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই। তুমি চেঞ্জ হয়েছো, কিন্তু এরা হয় নি। ইন ফ্যাক্ট তোমার ফ্যামিলির কেউই হয় নি। কী করে যে এসব পাতি মিডল ক্লাস পাবলিকদের নিয়ে এতদিন চালালে, তুমিই জানো”।
অতীন বলল, “সবার আগে আমার বিয়েটা করাই উচিত হয় নি। এমন জোর দিল তখন, আমার আর কিছু বলার রইল না”।
বিদীপ্তা বলল, “ঠিক আছে। এসব ভুলে যাও। আমি মিস্টার দাসের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। অহনাকে দিয়ে যা যা করানোর তোমাকে করিয়ে নিতে হবে। এসব ফেলে রাখা ঠিক না। আচ্ছা, একটা কথা বল। আমাকে কি খুব খারাপ মনে হচ্ছে?”
অতীন বলল, “কেন খারাপ মনে হবে?”
বিদীপ্তা বলল, “অ্যাকচুয়ালি আমি খুব এক্সাইটেড। আমার আর তর সইছে না। বাবার কত বন্ধু আছে, তারা আসবে। বড় করে একটা রিসেপশন হবে। বাবা প্রায়ই কথা শোনাতো আজকাল। কেন বিয়ের কথা ভাবছি না, এত বড় বাড়ির মেয়ে, এককালে আমার পূর্ব পুরুষেরা জমিদার ছিলেন, এতদিন পর শান্তি লাগছে। তাই আমি এসব বলে যাচ্ছি। দেখো তোমার যদি মনে হয় ওই ফ্ল্যাটটা তুমি বিক্রি করবে না, রাখবে বা অহনা আর তোমার ছেলেকেই দেবে, আই হ্যাভ নো ইস্যু। আমি কোন জোর করছি না কিন্তু। আমি ভাল সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র। এর বেশি কিছু না”।
অতীন বলল, “ঠিক আছে। আমি বুঝেছি। এভাবে বলছো কেন?”
বিদীপ্তা বলল, “আমি আমার ফ্ল্যাটটাও বেচে দিতে পারি। তারপর শহরের সব থেকে দামী বিল্ডিঙয়ের টপ ফ্লোরটা কিনবো একদিন”।
অতীন হাসল। ভাল লাগছিল। টুবলাইকে নিয়ে অহনা চলে যাবার পর থেকে ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি কাজ করছিল। বিদীপ্তার সঙ্গে কথা বলে সেটা অনেকটাই চলে যাচ্ছে। এটার দরকার ছিল।

মাঝে মাঝে তার ভবেশবাবু হতে ইচ্ছে করে। শুয়ে থাকবে দুটো চেয়ার জোড়া করে।
সমস্যার ব্যাপার হল চেয়ার জুড়ে কিছুতেই ঘুম আসে না। সে এভাবে ঘুমোতে পারে না। ট্রেনে বাসেও ঘুমোতে পারে না।
নিজের খাট ছাড়া ঘুমোতে কষ্ট হয়।
রাঙা পিসি ফোন করেছিল। অহনাকে ফোন করতে চাইছিল। সার্থক বাধা দিয়েছে।
বউদির সঙ্গে কথা না বলাই ভাল। বউদির নিজেকে এই পরিবার থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়াই ভাল। দাদাই যেখানে এত কিছু করল, সেখানে বউদিকে আটকে বা আগলে রাখার কোন দরকার নেই।
আরেকজন ফোন করেছিল। ব্যাঙ্গালোরের বন্ধু অমিত। সেক্টর ফাইভে একটা ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ওদের পছন্দ হলে ওরাই ব্যাঙ্গালোরে পোস্টিং এর ব্যবস্থা করে দেবে।
জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রাতের শহরটাকে দেখছিল সে।
ছেড়ে যেতে হবে। সবাই দূরে সরে গেলেও শহরটা অন্তত ছিল। সেটাও দূরে চলে যাবে। যেতে হলে যাবে। সর্বক্ষণ এই নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকা যায় না।
দাদার নোংরা করে যাওয়া সোফা, টেবিল সব পরিষ্কার করেছে সে। বউদির মত পারে নি, তবে করেছে। ঘরদোর এভাবে পড়ে থাকাটা মেনে নিতে পারে নি। পরিষ্কার করার দরকারটা ছিল। মিসেস সেন আরেকবার এসেছিলেন। "সত্যিই কি অহনারা চলে গেছে?"
সার্থক ক্লান্ত গলায় বলল, "আপনাকে তো বলেছি চলে গেছে। আর কী বললে বিশ্বাস করবেন বলুন তো?"
মিসেস সেন মুখে কাঁদো কাঁদো ভাব এনে বললেন, "মেনে নিতে পারছি না তো। খুব খারাপ লাগছে"। সার্থক কাঁদো কাঁদো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।
মিসেস সেন গলা নামিয়ে বললেন, "ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মত কিছু ব্যাপার নেই তো? ফ্ল্যাট কমিটি কিন্তু ভীষণ অ্যাক্টিভ। দাদাকে সাবধান করে দিও"।
সার্থক উত্তর দিল না। এর ফলে মিসেস সেনের বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হল যে সার্থক কিছু লুকোচ্ছে। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে বললেন, "তোমার বউদির নাম্বারটা দাও। আমি কথা বলছি"।
সার্থক বলল, "দেবো। নাম্বারটা আমার ফোনে ছিল। হারিয়ে গেছে"।
মিসেস সেন তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "যদি ও তোমাদের সবার এগেইন্সটে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস করে, তখন কিন্তু জেল অবশ্যম্ভাবী জানো তো?"
সার্থক বলল, "কী আর করা? খাবার দাবারের যা দাম হয়েছে। জেলে যদি ভাল খাবার পাওয়া যায়, তাহলে ক্ষতি নেই"।
মিসেস সেন বললেন, "কেন? সে চান্স আছে নাকি?"
সার্থক বলল, "হতেই পারে। এসব কি আগে থেকে বলা যায়?"

মিসেস সেন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও। অহনা ফ্ল্যাটের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে আছে তো। ওর নাম্বার পেয়ে যাবো। আমি আজকেই ওকে ফোন করবো"।
সার্থক এবার খানিকটা বিরক্ত হল। এই ভদ্রমহিলা বউদিকে জ্বালাবে এবার। তবে সে বাধা দিল না। বাধা দিলে আরো বেশি করে ফোন করবে। এরা এরকমই।
অতীন এলো রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ। সে দরজা খুলে দেখল প্রথম দিকের ধাক্কাটা অনেকখানি সামলে নিয়েছে অতীন। এখন আগের মতই স্মার্ট লাগছে।
তাকে দেখে বলল, "কখন এলি?"
সার্থক বলল, "অনেকক্ষণ। ঘরদোর ঠিক করলাম"।
অতীন জুতো পরেই ঘরে ঢুকে গেলো। সার্থক বলল, "জুতো খুলবি না?"
অতীন বলল, "তোর বউদির ভয় তো এখন আর নেই। নাকি এখনো তোকে চমকাচ্ছে?"
সার্থক বলল, "কিছুই করছে না। উল্টে তুইই বেশি স্বাধীন হয়ে গেছিস"।
অতীন সোফায় বসে বলল, "তাতে আমারই লাভ। যে রিলেশনটা থেকে বেরোনোর দরকার ছিল, বেরোতে পেরেছি। ক'জন পারে? এসব ওল্ড সেন্টিমেন্ট থেকে বেরনোটা মাস্ট। নইলে মানুষ উন্নতি করতে পারে না। ক'দিন অপেক্ষা কর, তুই নিজেই সেদিন বলবি আমি যা করেছি, ঠিকই করেছি"।
সার্থক বলল, "ঠিক আছে। আসল কথাটা বলি। রাঙা পিসি জানতে চাইছিল তুই বৃদ্ধাশ্রমে যে অ্যাডভান্স করেছিলি, সেটা ওরা রিফান্ড করে দেবে তো?"
অতীন অবাক হয়ে বলল, "কেন? রিফান্ডের গল্পটা আসছে কেন?"
সার্থক বলল, "পিসি বাবাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে চায়। বৃদ্ধাশ্রমে থাকুক, চায় না"।
অতীন রেগে গেল, "ওসব কিছু না। বরং দেখাতে চায় আমি বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়েছি। এখন উনি বাবাকে দেখভাল করে মহান সাজবেন। বুঝিস না এসব? এগুলো সব আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ব্রাউনি পয়েন্ট পাবার ধান্দা"।
সার্থক বলল, "এসব কী বলছিস তুই? নিজের দাদাকে কেউ দেখতে চাইছে, এর মধ্যে ব্রাউনি পয়েন্ট আরনিং এর গল্প এল কোত্থেকে?"
অতীন বলল, "এগুলো সব ইন্টার রিলেটেড। তুই ছোট বলে এসব বুঝিস না"।
একটা করে জুতো খুলে ঘরের দুদিকে ছুঁড়ে মারল অতীন। জোর ভলিউমে টিভি চালিয়ে দিল। সার্থক বলল, "খেয়েছিস?"
অতীন বলল, "হ্যাঁ। খেয়ে এসেছি"।
সার্থক বলল, "ঠিক আছে, আমি নিচ থেকে খেয়ে আসি"।
অতীন কিছু বলল না। টিভি দেখতে লাগল। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সার্থকের কান্না পেয়ে গেল। বউদি থাকলে বাইরে খাবার কথা বললে চোখ পাকিয়ে তাকাতো।

রাত দশটা নাগাদ ফোনটা এলো।

অহনা টুবলাইকে ঘুম পাড়িয়ে সবে খেতে বসেছিল।

আন-নোন নম্বর থেকে ফোন দেখে ধরল।

“হ্যালো”।

“অহনা বলছেন?”

মহিলা কণ্ঠস্বরটা চিনলো না সে। বলল, “হ্যাঁ। কে বলছেন?”

“আমি বিদীপ্তা। অতীনের থেকে আপনার নাম্বারটা নিলাম”।

অহনা চুপ করে গেলো।

বিদীপ্তা বলল, “হ্যালো। হ্যালো। শুনুন, আমি খুব ফ্র্যাঙ্কলি কিছু কথা বলতে চাই। আপনার ভালোর জন্যই”।

অহনা বলল, “বলুন”।

বিদীপ্তা বলল, “দেখুন, আমি অতীনের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। আপনি যা যা কমপেনসেশন চান, সেগুলোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যেহেতু ব্যাপারটা মিউচুয়ালি হচ্ছে, সেখানে সমস্যা হবার কথা না। আপনি যদি কাইন্ডলি কো অপারেট করেন, আমাদের বিয়েটা তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়”।

অহনা বলল, “আমি তো চলেই এলাম। আর তো কোন অসুবিধে হবার কথা না”।

অনীশ চেয়ারে বসল। অহনার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকালো।

বিদীপ্তা বলল, “না না। অসুবিধের কোন ব্যাপার না। অন্য অনেক ব্যাপার আছে। সেটলমেন্ট তো একটা করতেই হয় তাই না? দেখুন আপনি আন এমপ্লয়েড, টাকার ব্যাপারে তো অতীনের উপর একটা ডিপেন্ডেন্সি আপনার থাকবেই। আপনি সেটাই বলুন, কীভাবে চান। একবারে থোক টাকা না মান্থলি? যেমন বলবেন, তেমন ব্যবস্থা হয়ে যাবে”।

অহনা বলল, “আমি কিছু ভাবি নি। ভেবে বলব। ঠিক আছে?”

বিদীপ্তা বলল, “ভাবুন ভাবুন। আমরা দুজনেই যেহেতু স্যালারিড, আপনি কমপেনসেশন নিয়ে ভাববেন না”।

অহনা চুপ করে রইল।

বিদীপ্তা বলল, “আমার এটাই নাম্বার ওকে? আপনার যখন যা মনে হবে, ফিল ফ্রি টু কমিউনিকেট। প্লিজ। আমরা একটা মডার্ন সোসাইটিতে আছি, এখন আমরা যত তাড়াতাড়ি এই ধরণের সেটলমেন্ট করে নিতে পারি, তত ভাল। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম আমাদের ল ইয়ারকে দিয়ে ফোন করাবো, তারপর মনে হল আমিই কথা বলে নি। আমাদের কথা বলাটা দরকার। ও তো ভয় পাচ্ছিল। বলতো আপনাকে বললে আপনি অনেক ঝামেলা করবেন। কিন্তু আপনি যে ম্যাচিউরিটি দেখিয়েছেন, তা আনবিলিভেবল। আমার মনে হয়েছে

আপনিও একজন ম্যাচিওর উইম্যান, তাই বলছি। বাচ্চাটার কথাও ভাবতে হবে। আফটার অল ও অতীনেরই ছেলে"।
অহনা বলল, "ঠিক আছে। আপনি যা বলবেন, সেভাবেই হবে। ভাববেন না। তবে আপনাকে একটা কথা বলি"।
বিদীপ্তা বলল, "বলুন বলুন। প্লিজ ফিল ফ্রি"।
অহনা বলল, "ভাদ্র মাসে রাস্তার কুকুরগুলোকে দেখবেন, যাকে পায়, তার সঙ্গে সেক্স করতে শুরু করে দেয়। বাবা মা, কিছুই মানে না। একসঙ্গে থেকেও অতীন যেটা করল, নিশ্চয়ই এর পরেও করবে। সম্পর্ক ইত্যাদি তো বোঝে না। কমিটমেন্ট বলেও যে কোন জিনিস হয়, জানে না। শব্দটার নামই শোনে নি হয়তো। আপনি আপনার মা, ঠাকুমা, মানে এরা যদি এখনো বেঁচে থাকেন, এদের অতীনের কাছ থেকে দূরে রাখবেন। বলা যায় না আপনার অজান্তেই এদের সঙ্গে ভাদ্র মাসের কুকুরের মত শুয়ে পড়বে। তখন আপনারই বদনাম হবে"।
বিদীপ্তা চিৎকার করতে শুরু করল, "হাউ ডেয়ার ইউ! আপনার সাহস তো কম না!"
অহনা ফোন কেটে দিল। তার কান মাথা ঝা ঝা করছিল। অনীশ তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।
অহনা শান্ত কণ্ঠে বলল, "তাকিয়ে থাকিস না। খেয়ে নে। খুব বড় ভুল করে ফেললাম। ভেবেছিলাম কিছু বলব না। চিপ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলারই প্রবৃত্তি হয় না। তাও পারলাম না। কিছু না বলতে গিয়েও বলে ফেললাম। এখন খারাপ লাগছে"।
অনীশ বলল, "কে ফোন করেছিল?"
অহনা উঠে পড়ল, "কেউ না। বাদ দে"।
অনীশ বলল, "খাবি না?"
অহনা বলল, "ভাল লাগছে না। ঢাকা দিয়ে রাখলাম, পরে খেয়ে নেবো"।
অনীশ বলল, "অন্য লোকের উপর রাগ করে না খেয়ে থাকবি?"
অহনা কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে বলল, "তা ঠিক। খেয়ে নি"।
অহনার ফোন আবার বাজতে শুরু করল। অহনা দেখল অতীন ফোন করছে।
সে ধরল, "বল"।
অতীন চিৎকার করতে শুরু করেছে ও পাশ থেকে, "তুই কী বলেছিস বিদীপ্তাকে?"
অহনা বলল, "ভুল করে ফেলেছি। ওসব বলা উচিত হয় নি। ওকে বলে দিও আমি সরি বলে দিয়েছি। আমার রুচিতে বাধা উচিত ছিল। কেন বাধল না, বুঝতে পারছি না"।
অতীন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। অহনা ফোন কেটে দিয়ে সুইচ অফ করে দিল। চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, "সম্পর্ক ভাঙলে কী কদর্য রূপ নিয়ে চলে আসে, ছিঃ। আমি ওই কথাগুলো বললাম কী করে?"
অনীশ বলল, "খেয়ে নে"।
অহনা বলল, "হ্যাঁ। ঠিক। খেয়ে নি"।
অহনা খেতে শুরু করল। সে বুঝতে পারছিল প্রবল উত্তেজনায় তার পা দুটো কাঁপছে। এটা তার বরাবর হয়। খুব উত্তেজিত হয়ে গেলে পা কাঁপতে শুরু করে। মাথা ঠাণ্ডা হতেও বেশ খানিকটা সময় নেয়।
ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময় রাস্তায় একটা ছেলে তাকে টিজ করে একটা বাজে কথা বলেছিল। অহনা সাইকেল থেকে নেমে ছেলেটাকে সটান চড় মেরে দিয়েছিল। ছেলেটা কিছু বলতে পারে নি। হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। সাইকেলে উঠে অহনা প্যাডেল করতে গিয়ে টের পেয়েছিল এরকম রাগ হলে তার হাত পা কাঁপে।

অনেক দিন পর এরকম রাগ হল। পরক্ষণে নিজেকে এটা বলেই সান্ত্বনা দেওয়া শুরু করল, এই বিষয়টা এতটাই অকিঞ্চিৎকর যে রাগ করারও কোন মানে হয় না। একটা সময় স্বাভাবিক হল সে।
খাবার নষ্ট করে না কোন কালেই। পুরো খাবার শেষ করে উঠে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুধু...

খেয়ে এসে সার্থক ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখল অতীন প্রবল উত্তেজনায় চিৎকার চ্যাঁচামেচি করছে। তাকে দেখে ছুটে এলো, “এই যে, শোন, শোন, তোর প্রিয় বউদি কী করেছে জানিস?”

সার্থক বিস্মিত মুখে বলল, “কী করেছে?”

অতীন বলল, “ওকে বিদীপ্তা ফোন করেছিল। ওপেন মাইন্ডে ফোন করেছিল যে কমপেনসেশনের ব্যাপারটা ডিসকাস করে নেবে। তার পরিবর্তে ও কী করল জানিস? বলেছে আমি নাকি ভাদ্র মাসের কুকুরের মত, যাকে পাই তার সঙ্গে শুয়ে পড়ি। কত বড় সাহস”!

সার্থক বলল, “ভুল কী বলেছে? ঠিকই তো বলেছে”?

অতীন থমকে গেলো। কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বলল, “ঠিক বলেছে মানে?”

সার্থক বলল, “তুই ইদানীং যা শুরু করেছিস তাতে এর বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কথা আর কী হত?”

অতীন সার্থকের দিকে হাঁ করে তাকালো। তারপর ছুটে এসে সার্থকের মুখে একটা সজোরে ঘুষি মারল। আচমকা ঘুষিটার জন্য সার্থক একবারেই প্রস্তুত ছিল না। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। অতীন ছুটে গিয়ে সার্থকের পায়ে লাথি কষালো। সার্থক ককিয়ে উঠল। অতীন আবার চিৎকার করল, “এই হাল করবো তোর। একটা কথা অহনার হয়ে বলবি, তারপর আমি বুঝে নেবো। থাকিস তো আমার দয়ায়, আমার টাকায় খাস। তারপরে ওর হয়ে কথা বলিস? এতো সাহস হয় কী করে?” সার্থকের ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছিল। সে অবস্থাতেই সে উঠে বসল।

অতীন বলল, “বেরো। বেরো আমার বাড়ি থেকে”। সার্থককে হাত ধরে টানতে টানতে ঘর থেকে বের করে ফ্ল্যাটের বাইরে বের করে দিল অতীন।

সার্থক হতভম্ব হয়ে গেছিল। এ অতীনকে সে চেনে না। অন্য কেউ যেন অতীনের উপরে ভর করেছে।

কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে সে লিফটে উঠল। বেসমেন্টে ভবেশবাবু পায়চারি করছিলেন। সার্থক লিফট থেকে বেরোতে গিয়ে পড়ে গেলো।

ভবেশবাবু ছুটে এসে তাকে তুললেন, “একী, কী হল? এসো এসো”।

চেয়ার নিয়ে এসে বসালেন। জল খাওয়ালেন।

সার্থক মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। ভবেশবাবু একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। সে কিছুই শুনতে পেলো না।

ভবেশবাবু তার চোখে মুখে জল দিলেন। খানিকক্ষণ পর সার্থক ধাতস্থ হল। ভবেশবাবুকে বলল, “ক’টা বাজে?”

ভবেশবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, “সাড়ে এগারোটা”।

সার্থক বলল, “এত রাতে বাস চলবে না বোধ হয়”।

ভবেশবাবু বললেন, “না। তা চলবে না। কেন? কোথায় যাবে?”

সার্থক বলল, “পিসির বাড়ি যেতাম। কিন্তু এতো রাতে যেতে পারবো না”।
ভবেশবাবু বললেন, “ট্যাক্সিতে যাবে?”
সার্থক মাথা নাড়ল, “অতো টাকা নেই”।
ভবেশবাবু তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, “আমি টাকা দিচ্ছি। যেতে পারলে যাও”।
সার্থক বলল, “নাহ। থাক। পিসি ঘুমিয়ে পড়েছে”।
ভবেশবাবু বললেন, “তাহলে তুমি ফ্ল্যাটে চলে যাও”।
সার্থক বলল, “না। ওখানে আর যাবো না”। ভবেশবাবু বললেন, “তুমি আমার ঘরটায় ঘুমোতে পারবে?”
সার্থক বলল, “আপনি কোথায় শোবেন তাহলে?”
ভবেশবাবু বললেন, “আমি তো এখানেই শুয়ে পড়ি। কোন অসুবিধা হবে না”।
অন্য দিন হলে হয়তো বারণ করতো সে। এখন পারলো না। ভবেশবাবুর ঘুপচি ঘরের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ফার্স্ট এইডের জিনিসপত্র ঘরে ছিল। ভবেশবাবু কিছু ফার্স্ট এইড করে দিয়েছিলেন।
গুঁটি শুটি মেরে খাটে শুয়ে পড়ল সে। মা মারা যাবার দিনটার কথা মনে পড়ে গেলো তার। দাদা তাকে জড়িয়ে ধরে অনবরত কেঁদে যাচ্ছে। সে অতীনকে সামলেছিল সারাটা দিন।
পায়ে প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছে। প্রবল রাগে কেউ আঘাত করলে সর্ব শক্তি দিয়ে সে আঘাত করে। অতীনকে দেখে বোঝা সম্ভব না সে এতটা রেগে যেতে পারে। তার রাগ কম। কিন্তু যখন হয়, এমনই হয়।
পকেটের মধ্যে ফোনটা পড়ে যায় নি। ভাইব্রেট করে উঠল।
সার্থক দেখল অতীন ফোন করছে।
ধরল সে, “বল”।
অতীন বলল, “কোথায় তুই?”
সার্থক বলল, “আছি। বল কী হয়েছে”।
অতীন বলল, “ঘরে চলে আয়”।
সার্থক ফোনটা কেটে দিল।

বাবা ছোটবেলায় নক্ষত্র চেনাতো।

গ্রীষ্মে ছাদে শুয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল চিনতে চিনতে ঘুমিয়ে পড়তো। আজকাল ঘুম আসতে চায় না। চোখ বন্ধ করলেই যদি ঘুম হতো, তার থেকে ভাল আর কিছু হত না।

টুবলাই নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। ছোটবেলাটা এমনই হয়। নিশ্ছিদ্র ঘুম হয়। মা বলতো, অনেকেই ভাবে সংসারে অশান্তি হলে বাচ্চাদের মনে কোন প্রভাব পড়ে না। এটা খুব ভুল ধারণা। বাচ্চাদের মনে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। কোন সার্ফ এক্সেল সে দাগ মুছতে পারে না। এ ক্ষত বড় হলে আরো বাড়বে। বাড়তে বাড়তে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে।

মাথার মধ্যে কেমন একটা দপদপ করছে। অহনা উঠে জল খেলো। টিভির ঘরে গিয়ে বসল। বাবা মা থাকা আর না থাকার মধ্যে অনেক পার্থক্য। কাউকে দিয়ে বাবা মার অভাব পূরণ করা যায় না। অসম্ভব কাজ সেটা।

এই সময়টাই মার কথা মনে পড়ে।

জড়িয়ে ধরে শুলে সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যেতে পারতো সে।

যারা মা বাবাকে দেখে না, দেখা যায় তাদের বাবা মা সারা জীবন বেঁচে আছে। যাদের বাবা মাকে দরকার হয়, তাদের বাবা মাকেই যেন আগে চলে যেতে হয়।

কয়েকদিন ধরে এক বদভ্যাস হয়েছে তার। ঘুমনোর আগে সোশাল মিডিয়ার রিল দেখা। তার সঙ্গে টুবলাই দেখতো।

ফোন অন করতে চাইছিল না সে। অভ্যাসটা সেই ফোনের দিকেই টানছিল তাকে। অগত্যা অন করল। বসার ঘরের সোফায় শুয়ে ফোন দেখতে দেখতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সকালে অনীশ ঘুম ভাঙালো, "কী রে, এখানেই শুয়েছিলি?"

চোখ খুলে উঠে বসল অহনা, "হ্যাঁ। কখন যে চোখ লেগে গেছিলো বুঝতে পারি নি"।

অনীশ বলল, "আর ফোন করে নি তো?"

অহনা বলল, "নাহ। আর করে নি"।

অনীশ বলল, "আমার মনে হচ্ছে এবার একটা উকিলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। তোর অধিকার সম্পর্কে তোর জানা দরকার। তুই যদি নিজে কিছু নাও নিতে চাস, টুবলাই আছে, ওর জন্য একটা সাপোর্ট তো দরকার। এভাবে নিশ্চিন্তে থাকতে দেওয়া যায় না। ও যখনই দেখছে তুই কিছু বলছিস না, তখন উল্টে আঘাত করতে চাইছে"।

অহনা ভাইয়ের দিকে তাকালো। ছোটবেলায় সারাক্ষণ তার পিছন পিছন ঘুরতো। কত বড় হয়ে গেছে। সে হেসে ফেলল, "তুই কি রাত জেগে এসব ভাবলি?"

অনীশ বলল, "ভাবতে তো হবে। তুই একবারেই ভাবিস না আমার কোন অসুবিধে হবে। এটা তোরও বাড়ি। আর আমি তোরই ভাই। টাকা পয়সার ব্যাপারে কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু জামাইবাবু যেটা করেছে, তাতে যদি তুই ছেড়ে দিস, তাহলে দেখা যাবে উল্টো সমস্যা তৈরি করবে। বুঝতে পারছিস আমি কী বলছি?"

অহনা বলল, "বুঝেছি। কিন্তু আমার না এসব নিয়ে কথা বলতেই ভাল লাগছে না। কথা বললেই সমস্যা হচ্ছে। মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে। দুদিন পর এসব করা যেতে পারে। তার আগে একটু সুস্থির হই"।

অনীশ বলল, "ঠিক আছে। আমি কথা বলে রাখছি। তোর যখন সুবিধা হবে, তখন কথা বলবি। ওই মেয়েটা কোনদিন ফ্ল্যাটে এসেছিল?"

অহনা মাথা নাড়ল, "নাহ। আমি চিনিই না। ফোন করেই কেমন একটা মোড়লের মতো কথা বলতে শুরু করল। কী সব সোসাইটি দেখাচ্ছে। এমন সোসাইটি যেখানে বিন্দুমাত্র এথিকস নেই, সে সোসাইটির মুখে লাথি মারা উচিত"।

অহনা কথাটা বলে হেসে ফেলল।

অনীশ বলল, "হ্যাঁ, এরকম অনেক সোসাইটি আছে শুনেছি। বউ শেয়ারিং হয়..."

অহনা চোখ পাকাল, "অ্যাই তুই তো খুব পাকা হয়ে গেছিস। এসব কোত্থেকে শুনেছিস?"

অনীশ বলল, "আমিও বড় হয়ে গেছি"।

অহনা বলল, "না হওয়াই ভাল। বড় হওয়া মানে যদি এরকম করার স্বাধীনতা পাওয়া যায়, তবে সে বড় না হওয়াই ভালো"।

অনীশ বলল, "আমি বাজারে বেরোচ্ছি। বাজার করে আনি"।

অহনা বলল, "কত টাকা আছে রে তোর? অসুবিধে হচ্ছে না? আমাদের দুজনকে টানতে পারবি?"

অনীশ বলল, "এসব নিয়ে ভাববি না। তুই শুধু একটু শক্ত হ। ছেড়ে টেরে দেওয়ার কথা ভাবিস না। তুই যদি এত সব কিছুর পরে ছেড়ে দিস, তাহলে জামাইবাবু ভেবে নেবে এসব ও করতেই পারতো। কোন মানুষ শুধু মাত্র তার কাছে টাকা আছে বলে যা ইচ্ছে করতে পারে না। এটা নিয়ে তুই স্টেপ নিবি। নিতেই হবে। বুঝেছিস কী বলছি?"

অহনা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "হু"।

পুলকেশ ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে বসে দেখল কেমন যেন ঠাণ্ডা লাগছে। এসির এই এক সমস্যা। বেশিক্ষণ চললে ঠাণ্ডা লেগে যায়। এক্ষেত্রে কিছু বলাও যায় না। ক্লায়েন্টরা টাকা দেয়। সে কী বলবে?

কত রকম ক্লায়েন্ট থাকে। একেক জন, একেক রকম। তার টাকা দরকার। সে অতো কিছু বোঝে না। যে যা বলে, তাই করে।

দরজা খুলে শুধু প্যান্টি পরে তার ক্লায়েন্ট বেরোল। তাকে বলল, "তোমার টিপসটা টেবলের উপরে রেখেছি। নিয়ে যেও। আর তোমাকে তো কিছু দেওয়ার ইন্সট্রাকশান নেই"।

পুলকেশ বলল, "না ম্যাম। আমি এখন যাই?"

ক্লায়েন্ট তার কোলে এসে বসল, "এখনই যাবে? মর্নিং সেক্সটা কে করবে? আমার বাবা?"

পুলকেশ অভ্যস্ত হাতে ক্লায়েন্টের শরীর ছুঁতে শুরু করল। ক্লায়েন্ট চোখ বন্ধ করে পরম আশ্লেষে শীৎকার করতে করতে তাকে শক্ত করে ধরে ঠোঁটে চুমু খেতে শুরু করল। পুলকেশ পরের স্টেপে যাওয়ার কথা ভাবছিল, এমন সময় ক্লায়েন্টের ফোন বেজে উঠল। "উফ, একটু শান্তি নেই", বলে ফোন ধরল তার ক্লায়েন্ট, ফোনের স্পিকার অন করে খাটে রেখেই বলল "হ্যাঁ, বল"।

"ভাই রাতে বাড়ি ফেরে নি। কী করব?" ও প্রান্তের গলাটা কেমন চিন্তিত শোনালো।

ক্লায়েন্ট তার জামা খুলে দিল। তাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে নিঃশব্দে তার বুকে চুমু খেতে খেতে বলল, "তো? তোমার কী সমস্যা? কষ্ট হচ্ছে?"

"কষ্ট না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না। ফ্ল্যাটের লোকজন ঝামেলা করতে পারে। সবাই তো জিজ্ঞেস করবে এবার"।

ক্লায়েন্ট পুলকেশের শরীরে আদর করছে। পুলকেশ জাগছে। এখন শুধু নির্দেশের অপেক্ষা। ক্লায়েন্ট বলল, "করলে করবে। তুমি তোমার কাজ করে যাও। নিজের মত করে চল। পাত্তা দিও না কিছু। বুঝেছো?"

"ঠিক আছে। তাই করবো। আজ কি দেখা করবে সোনা?"

"দেখা? আজ একটা মিটিং আছে। রাতের আগে শান্তি নেই। কাল দেখা করি?"

"আমি আর পারছি না একা থাকতে। তোমার ল ইয়ারকে ফোন করবো আজ। দেখি উনি কী বলেন। ভীষণ রাগ হচ্ছে অহনার উপরে। সামনে পেলে খুন করে ফেলতাম"।

তার গলায় চুমু খাচ্ছে ক্লায়েন্ট। ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে এসে চুমু খেয়ে বলল, "রাগ কোর না সোনা। রাগ করার কিছু হয় নি। ও তো একটা নিঃস্পৃহ ভাব নিয়ে ছিল। কালকে বেরিয়ে গেলো ওর ভেতরে কী চলছে। এখন আমাদের খেলতে সুবিধা হবে। সবটাই তো খেলা। যেটা আমাদের জিততেই হবে, তাই না? আমরা একসঙ্গে থাকবো না বল? বাবা রবিবার ডেকেছে, তার আগে একটা ভাল ব্লেজার কিনে নিও। আমি কিনে দেবো, ঠিক আছে?"

“কবে আর কিনে দেবে? আজ তো দেখাই করবে না বলছো। এভাবে হয় নাকি? দিনটাই খারাপ যাবে আজ। ধুস”।
ক্লায়েন্ট পুলকেশের মুখের উপরে বসে পড়েছে। ফোনটা খাট থেকে তুলে মুখের কাছে এনে পর পর চুমু খেতে খেতে বলল, “ঠিক আছে। লাঞ্চের সময় দেখা করবো তাহলে। তোমার ব্লেজারটা কিনে দিয়ে আবার যে যার অফিসে ফিরে যাবো। ওকে সোনা?”
“ওকে। তাই করবো। আর ভাইকে কী করবো সেটা তো বল। ফোন করছি, ধরছে না”।
“কেন ফোন করছো কেন? ফোন করার কী আছে? ও যেটা ডিজার্ভ করে, সেটাই পেয়েছে। এর বেশি কিছু দেওয়ার নেই। যা পারে করুক। অতো পাত্তা দিও না। পাত্তা পেলেই মাথায় চেপে বসবে”।
“ঠিক আছে। তাই করছি। তাহলে লাঞ্চে তো?”
“হ্যাঁ। লাঞ্চে। আর শোনো...”
“বল”।
“কিছু টাকা লাগবে। একটা চ্যারিটিতে দেওয়ার ছিল। আমি দিয়েছি, আমার মনে হয় তোমারও দেওয়া উচিত”।
“এখনই পাঠাচ্ছি সোনা। বাই”।
ফোন রেখে পুলকেশকে আরো আদর করতে শুরু করল তার ক্লায়েন্ট।
তার ফোনে টাকা ক্রেডিট হবার মেসেজ এলো।
ক্লায়েন্ট ফিসফিস করে তার কানের কাছে বলল, “চ্যারিটির টাকা এসে গেছে”।
পুলকেশ অভ্যস্ত শরীরে তার কাজ শুরু করল।
ক্লায়েন্ট কী বলল, কার সঙ্গে কথা বলল, তার শোনার দরকার নেই। আগে যাও বা মনে রাখতো, ইদানীং সেসবও মনে রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না।
এটাই তার কাজ। এটাই তার অফিস...

টুবলাইয়ের স্কুলের জন্য গিয়ে তার নিজের স্কুলের বন্ধু শুভ্রার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো অহনার। শুভ্রা তাকে দেখে ডাকল, "কীরে, তুই এখানে? কী হয়েছে?"
মিথ্যে কথা বা বানিয়ে কিছু বলা অভ্যেসে নেই তার। অহনা বলল, "এখন থেকে এখানেই পড়বে আমার ছেলে। আমি পতিগৃহ থেকে বিতাড়িত?"
শুভ্রা হাঁ করে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, "মানে? এ আবার কী? বিতাড়িত মানে কী?"
অহনা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সত্যি বলাও বিপদ। সবাইকে সব বলতে হয়। শুভ্রাকেও বলল। শুভ্রা বলল, "তুই কিছু না বলে চলে এলি?"
অহনা বলল, "আমি পারি না ওসব ঝামেলা করতে। কী করতাম"?
শুভ্রা বলল, "সত্যি ভাই। তুই বলেই ছাড়লি। আমি হলে জুতিয়ে লাল করে দিতাম। যেমন কুকুর, তেমন মুগুর"।
অহনা বলল, "তুই বল। তোর কী? ছেলে না মেয়ে?"
শুভ্রা বলল "মেয়ে। শোন না, তোকে একটা কথা বলি? কিছু মনে করবি না তো?"
অহনা বলল, "বল। মনে করার কী আছে? আমি সেসব স্টেজ পেরিয়ে এসেছি"।
শুভ্রা বলল, "তুই বসে থাকিস না। যথেষ্ট সুন্দরী আছিস এখনো। আবার বিয়ে করে নিস"।
অহনা হেসে ফেলল, "ধুস। বিয়ে করে নেবো? কেন? আবার কারো বাড়ি ঝি চাকর হবার জন্য এত এফোর্ট দেবো কেন?"
শুভ্রা বলল, "ঝি চাকর হওয়া মানে?"
অহনা বলল, "হাউজ ওয়াইফ ব্যাপারটাকে অনেক গ্লোরিফাই করা হয়। বিরাট কাজ করছি। আসলে কী করছিলাম বল? সকাল থেকে গাধার খাটনি খেটে যাচ্ছি। একজন খেটে যাবে, আরেকজন ঠ্যাং তুলে ঘুমোবে, বাইরে যা খুশি করে আসবে। মানে কেন? আমি কেন আবার আরেকজনকে এসব করতে দেবো। তুই তো খুব ভাল গান গাইতিস। সে সুখ্যাতিতেই বিয়ে হয়েছিল না? কত জায়গায় গান গাইছিস এখন? পর্ণা নাচের জন্য আমাদের ব্যাচ শুধু না, গোটা এলাকাতে বিখ্যাত ছিল। বিয়ের পর সবার আগে ওর নাচ বন্ধ হয়ে গেল। কী লাভ হল বিয়ে করে। সব সময় বিয়ের জন্য বলিপ্রদত্ত হয়ে থাকতে বয়ে কেন"?
শুভ্রা বলল, "তাহলে খাওয়াবে কে? হাজব্যান্ড রোজগার করে বলেই তো খেতে পারছি। সেটা ভুললে চলবে? তাহলে ওর কথা তো শুনতেই হবে"।
অহনা বলল, "সেক্ষেত্রে টাকা রোজগার করে নিতে পারলেই আর বিয়ে করার দরকার নেই। আমি তো সেই চেষ্টাই করছি। কারো গলায় ঝুলে নিজের লাইফের বারোটা বাজানোর কোন ইচ্ছে আর নেই"।
শুভ্রা তার হাত ধরে বলল, "তুই পারবি। তোকে তো আজ থেকে দেখছি না। খুব খারাপ লাগল তোর ব্যাপারটা শুনে"।

অহনা বলল, "আমার লাগে নি। আমার ভালই লাগছে। মনে হচ্ছে গরমের ছুটি কাটাচ্ছি"।
শুভ্রা বলল, "সেটলমেন্ট করেছিস কিছু"?
অহনা বলল, "সবাই সেটাই বার বার জিজ্ঞেস করছে। ও হয়তো করবে। দেখা যাক কী হয়"।
শুভ্রা বলল, "আমার তো সব শুনে ভয় লেগে গেল রে। ব্যবসার কাজে আমার বর মাঝে মাঝেই কলকাতা যায়। কোনটা কাজে যায়, আর কোনটা অকাজে, কে জানে"।
অহনা হেসে ফেলল, "ধুস, ওভাবে ভাবিস না। পাগল হয়ে যাবি। অবিশ্বাস করা টেকা যায় না। আমি যদি আমার বরকে শুরু থেকে সন্দেহ করতাম, তাহলে এদ্দিনে পাগল হয়ে যেতাম। এসব মাথায় ঢোকাস না"।
শুভ্রা বলল, "তুই কী দিয়ে তৈরি বল তো? তোর মতো হতে পারলে ভাল হত"।
অহনা বলল, "আমি এরকম ছিলাম না। হেজে গেছি আর কী। ছেলেটার জন্য বেঁচে থাকতে হবে"।
শুভ্রা বলল, "ওভাবে ভাবিস না। ভাল কিছু হবেই। দেখে নিস"।
অহনা বলল, "দেখা যাক। আমার একটা জিনিসেই আপত্তি। সেটা হল সহানুভূতি। আমাকে কেউ সহানুভূতি দেখালে ভারি বিরক্তি লাগে। এভাবে চলতে আমার সমস্যা নেই। আহা রে, ওর এরকম হল, ওর কী হবে, এসব চাউনি বা কথা না শুনতে পেলেই হবে। সিম্পল"।
শুভ্রা বলল, "ঠিক আছে। তোকে সহানুভূতি দেখাবো না। এখন থেকে রোজই তো দেখা হবে"।
অহনা বলল, "হ্যাঁ। যত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারি, তত ভালো। টুবলাইয়ের স্কুল রেগুলারলি চলতে শুরু করলেই ঠিক হয়ে যাবে"।
শুভ্রা বলল, "হ্যাঁ। যা সিলেবাস এটুকু বাচ্চাদের, তাতে আর সব কিছু ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। ঠিকই বলেছিস"।
দুজনেই হেসে উঠল।
বাজারে ফলের দোকানের কাছে পরিতোষ পালিতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। ভদ্রলোক তার থেকে কুড়ি বছরের বড়। বাবার সঙ্গে দেখা করতে তাদের বাড়িতে আসতেন। একদিন হুট করে বলে বসলেন অহনাকে বিয়ে করতে চান।
অহনা খুব রেগে গেছিল। বাবার বয়সী লোক, বাবার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে যে লোকটা আসলে তাকে দেখতে আসতো, রাগ হবারই কথা।
পরিতোষ পালিত তার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল।
অহনা দেখলোও না। মাথা দপদপ করতে শুরু করল।

এত সকালে কোন দিন হৃদিকে পড়াতে আসে নি সার্থক। কলিং বেল টিপতে সুনয়না দরজা খুলে তার দিকে অবাক চোখে তাকালো। সার্থক বলল, "কাকু আছেন?"

সুনয়না বলল, "কেন? তুমি কী বলবে বাবাকে?"

সার্থক ক্লান্ত চোখে সুনয়নার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কোন ভয় নেই। আমার মাইনেটা নিতে এসেছি"।

এবার সুনয়নার টেনশন কমল। তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠোঁটে কী হয়েছে?"

সার্থক বলল, "কিছু না। তোমার বাবাকে ডাকো। আমার টাকার দরকার। ব্যাঙ্গালোর যাবো"।

সুনয়না বলল, "মানে? এখনই যাবে?"

সার্থক বিরক্ত গলায় বলল, "কেন ফালতু বকছো? ডাকতে বললাম, ডেকে দাও"।

সুনয়না বলল, "বাবা নেই। বাজারে গেছে। মা মামাবাড়িতে গেছে"।

সার্থক বলল, "ঠিক আছে। আমার টাকার খুব দরকার। যদি লাস্ট মান্থের টাকাটা পাওয়া যেতো, ভালো হতো। উনি ফিরলে আমাকে জিপে বা ফো পে কিছু একটা করে দিতে বলবে প্লিজ?"

সুনয়না বলল, "ভেতরে এসো। বস"।

সার্থক বলল, "ফিরবেন শিগগিরি?"

সুনয়না বলল, "এসো না। বসো। ফিরবে"।

সার্থক ঘরে ঢুকে সোফায় বসল।

সুনয়না তার সামনে বসে নরম গলায় বলল, "কী হয়েছে? বলবে? আমাকে বলা যায়?"

সার্থক বলল, "দাদা ফ্ল্যাট থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। বন্ধুরা ব্যাঙ্গালোরে থাকে। আজ একটা ইন্টারভিউ আছে। পেলেও যাবো, না পেলে এমনিই চলে যাবো। ওখানে গিয়ে বলছে কিছু না কিছু পেয়ে যাবো"।

সুনয়না দুঃখিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এরকম কেন হল সার্থক? তোমার দাদা বউদি তো তোমায় খুব ভালোবাসতো?"

সার্থক বলল, "হয়ে গেছে। কী আর করা যাবে। আমরা সবাই ভুল বুঝি। প্রথমে ভাবে কেউ ভীষণ ভালবাসছে, তারপরে দেখা যায় সব কিছু মিথ্যে। একটার পর একটা মিথ্যে দিয়ে অদ্ভুত একটা ভয়ংকর স্বপ্নের পৃথিবীর মধ্যে থাকি সবাই। তারপর বাস্তবের মুখোমুখি হই যখন, বুঝতে পারি কীভাবে মুরগী হচ্ছিলাম। একটা বিরাট বড় পোল্ট্রির মধ্যে আছি আমরা। আনন্দে আছে, ঘুরছি ফিরছি। কে কখন গলা ধরে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়ে দেবে বোঝা সম্ভব না। সেটাই হয়েছে আমার সঙ্গে। কী করবো বল?"

সুনয়না মাথা নিচু করল। বলল, "আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ। আমি মানছি আমি ভুল করেছি। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। বাড়ি থেকে ক্রমাগত প্রেশার আসছিল। তোমাকে যখনই জিজ্ঞেস করেছি, তুমি

বলে দিয়েছিলে আমাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। একটা মেয়ে হওয়া মানে যে কী ঝামেলা, তা তোমাকে কী করে বোঝাই?"

সার্থক বলল, "না না ভুল করছো। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ করে কী করতাম? সেই তো আমাকে চলে যেতেই হতো। তুমি যা করেছো, তা ঠিকই করেছো। এখন তুমি থাকলেই বরং আমার যাওয়াটা কষ্টকর হয়ে যেতো। যা হয়েছে, ভালোর জন্য হয়েছে"।

সুনয়না তার কাছে এসে বসল। হাত ধরে বলল, "তুমি সত্যিই চলে যাবে?"

সার্থক বলল, "হ্যাঁ। আমার আর কিছু করার নেই"।

সুনয়না বলল, "আমাদের আর কোনদিন দেখা হবে না?"

সার্থক হেসে ফেলল, "হতে পারে। তুমি তোমার বরের সঙ্গে থাকলে, দেখা হল। চিনতে পারলে না। আমিও চিনবো না হয়তো"।

সুনয়না বলল, "আমার কাছে কিছু টাকা আছে। নেবে? না কোর না প্লিজ, টাকা তো টাকাই হয়। নাও। পরে যদি মনে হয়, ফেরত দিও। না দিলেও ক্ষতি নেই"।

সার্থক বলল, "না। আমার যেটা প্রাপ্য, আমি সেটা নিতেই এসেছি। ওভাবে কিছু দিও না"।

সুনয়না বলল, "জানতাম। তুমি নেবে না"।

সার্থক উঠল, "আমি বেরোই। বাবাকে বলে দিও"।

সুনয়না বলল, "যাও। গিয়ে মেসেজ করবে তো? নাকি তাও করবে না?"

সার্থক বলল, "আমার সব হিস্ট্রি মুছে ফেলো, নইলে যে রিলেশনটায় ঢুকেছো, সেখানে সমস্যায় পড়ে যাবে। আর কোন দিন কাউকে ঠকিও না। আমার বউদির অবস্থাটা যতবার ভাবছি, ততবার শিউরে উঠছি। একজন মানুষ কত বিশ্বাস নিয়ে আরেকজনের সঙ্গে থাকে। পরে যখন বুঝতে পারে পুরো সময়টা জুড়ে মানুষটা তাকে ঠকিয়ে গেছে, জাস্ট নিতে পারে না। এলাম। বাবাকে বোল টাকাটা পাঠিয়ে দিতে। খুব দরকার আমার"।

বেরিয়ে গেলো সার্থক। আর পিছন ফিরে দেখল না।

“তুই কোন দিন বরকে সন্দেহ করিস নি, না?” মনুপিসি বলল।
ছাদে চাদর পেতে বসে ছিল দুজনে। টুবলাই একটা বল নিয়ে এক মনে খেলে যাচ্ছে। মনুপিসির কথা শুনে অহনা বলল, “কী সন্দেহ করবো বল তো? সন্দেহ করার তো কিছু ছিল না। এসব হয়। এত কিছু ভেবে লাভ নেই”।
মনুপিসি বলল, “এরকমই হয়। কত লোক এসব করে আসে, বাড়ির লোক জানতে না পেরেই সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। আর কারো কারো তোর মতন হয়। থেকে গেলেই পারতিস। থেকে ঝামেলা করা উচিত ছিল। চলে এসে কিছু হয় না। বরকে লড়ে ফেরত আনতে হয়”।
অহনা বলল, “সব দায় আমার তো। আমার বর, আরেকজনের সঙ্গে সম্পর্ক করে আসবে। আর আমার দায় পড়েছে। কী যে বল না”। হেসে ফেলল সে।
শীত পড়ছে। মফস্বলের শীত ভারি মনোরম। রোদের তীব্রতা কমে গিয়ে নরম হতে শুরু করে। সবাই বাড়ি থেকে লেপ, সোয়েটার বের করে রোদে দেয়, গুড়ের খোঁজ পড়তে শুরু করে, শীত বিলাসীদের জন্য মফঃস্বল আদর্শ।
ছাদে ছাদে আড্ডা বসে গেছে। মনু পিসি বলছিল তার ব্যাপারে পাড়ার অনেকেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। তবে কেউ সাহস করে অহনার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে আসে নি। এখানে হিংসার ভাগটা কম। তবে কৌতূহল বড্ড বেশি। হাড়ির একবারে ভেতরে গিয়ে সব খবর জানতে পারলে এরা শান্তি পায় না।
মনু পিসি বলল, “আমার এখন তোর কাছে আসতে ভয় লাগে”।
অহনা বলল, “কেন? ভয় লাগে কেন?”
মনু পিসি বলল, “সবাই সারাজীবন ধরে আমাকে অপয়া বলে গেল। বর মরল, বাচ্চা হল না। মাঝে মাঝে আমারও নিজেকে ওই অপয়া বলেই মনে হয়। আয়নায় মুখে দেখি না। ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যাই। কারো একটা মুখ দেখে নি। এমনিতেই বাড়ি ফিরে এলি। আমাকে দেখে আরো খারাপ কিছু হয়ে যায় বুঝি?”
অহনা বলল, “বাহ। আমাকে ঠকালো আমার বর, সর্বনাশ হল আমার, তারপর আমি এখানে এলাম। আর তার দোষ হবে তোমার? এসব কথা মাথায় আনো কেন? কালকে কী হয়েছে শুনবে? কাল আমার বরের সেই মেয়ে ফোন করেছে। বলে সমাজ নাকি আধুনিক হয়ে গেছে। আমার যা দাবি দাওয়া, তা যেন ওর কাছেই বলে দি”।
মনুপিসি রেগে গেল, “দেখেছিস? কী সাহস? ঝ্যাঁটা মারলি না কেন ওই মাগীর মুখে?”
অহনা বলল, “আমি তো আমার বরকে ভাদ্রমাসের কুকুর বলে দিলাম। তাতে খুব ঝামেলা হয়েছে”। অহনা হাসতে শুরু করল।
মনুপিসি বলল, “ও মা। তুই এভাবে হাসছিস কেন রে মা? তুই ঠিক আছিস তো?”

অহনা বলল, "আমি না বুঝতে পারছি না আমার কী করা উচিত, কী বলা উচিত। আমি এখনো একটা ঘোরের মধ্যে আছি। ও বাড়িতে যখন ছিলাম, পাগলের মত সকালে উঠে কাজ করতে শুরু করতাম। ভোর হলেই ওঠো, ভাত বসিয়ে দাও, টুব্লাই কিছুতেই ঘুম থেকে উঠবে না, টেনে টেনে তোলো। রান্না বসাও, ওর টিফিনের ব্যবস্থা কর, শ্বশুরমশাইকে দেখো, দেওরকে দেখো, একটার পর একটা কাজ লেগেই থাকতো। এখন খালি কী মনে হচ্ছে জানো? আমার বর খুব ভাল একটা কাজ করেছে। দারুণ কাজ করেছে। আমি একটা ছুটি পেয়ে গেছি। এই যে আরাম করে বসছি, রোদ পোহাচ্ছি, অলস একটা জীবন, বিরাট চাকুরের ছেলে হবার জন্য টুবলাইকেও বড় করার সেই চাপ, কিচ্ছু নেই। অলস একটা জীবন, নিজের মত থাকতে পারছি... দু দিনেই এই জীবনটার প্রেমে পড়ে গেছি। কী যে ভাল লাগছে, আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না"।
মনুপিসি মাথা নেড়ে বলল, "তোর মাথাটাই গেছে"।
অহনা হাসতে হাসতে বলল, "তা গেছে। যা হয়েছে বেশ হয়েছে। খুব ভাল হয়েছে"।

আলমারির চাবিও রেখে গেছে অহনা। জামা খুঁজতে আলমারি খুলে দেখল সংসার চালানোর টাকা থেকে যে টাকাটা বাঁচিয়ে রাখতো, সেই টাকাটাও নিয়ে যায় নি। রেখে গেছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে ক্রিম, চিরুনি সব পড়ে আছে। "নাটক যত। টাকা পেলেই ল্যা ল্যা করে নিতে চলে আসবে"।

"বিপক্ষকে নজরে রাখছেন তো? কথা বলছেন তো?"

অর্ণব জানতে চাইছিল। অর্ণবের কথা বিদীপ্তা বলেছিল। ল ইয়ার। ডিভোর্স স্পেশালিষ্ট।

অতীন বলল, "কাল একবার ফোন করেছিলাম। বিদীপ্তাকে আজেবাজে কথা বলেছিল বলে"।

অর্ণব বলল, "মানে আরো রাগিয়ে দিয়েছেন। তাই তো?"

অতীন বলল, "সে রাগ তো ওর বরাবরই বেশি। ও রাগ দেখালে আমি কী করবো? আমার তো কিছু করার নেই। রাগ আছে বলে যা খুশি তো বলতে পারে না"।

অর্ণব বলল, "উঁহু, ভুল করছেন। আইন কানুন সব মেয়েদের হাতে। আপনি টর্চার করেছেন, এক্সপ্লয়েট করেছেন, ঠকিয়েছেন অভিযোগ করলে এতক্ষণে আপনাকে জেলের ভেতর থাকতে হত। আপনার কপাল ভাল যে এসব কিছু হয় নি"।

অতীন হতভম্ব হয়ে বলল, "এ কথাটা আমার মাথায় আসে নি"।

অর্ণব বলল, "মাথায় আসা উচিত ছিল। তাছাড়াও অনেক কিছু হতে পারে। এখন উনি বাপের বাড়ি চলে গেছেন। হয়তো ওর মাথায় তেমন কিছু নেই, কিন্তু ওর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সুবুদ্ধি বা কুবুদ্ধি যাই বলুন, ইনজেক্ট করার লোকের তো অভাব নেই। তারা যখন এসব গ্রাউন্ডে এগোবে, আপনার অনেক সমস্যা হতে পারে। চাকরি ক্ষেত্রে জানালে ওখানেও সমস্যায় পড়ে যাবেন"।

অতীন বলল, "চাকরি নিয়েও ঝামেলা হতে পারে?"

অর্ণব বলল, "হতে পারে। অনেকে আবার এক্সট্রিম পথ নেয়। সেসব খুব রিস্কি। খরচও বেশি"।

অতীন বলল, "সেটা কী?"

অর্ণব বলল, "সেসব শুনে কাজ নেই। ওই মার্ডার এটসেট্রার কথা আলোচনা করা ঠিক না"।

অতীন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "না না। ওসব না। ওসবে না যাওয়াই ভাল। অ্যাকচুয়ালি কাল বিদীপ্তা ওকে ভালোর জন্যই ফোন করেছিল। ও ফোনে আমাকে কুকুর টুকুর বলে দিয়েছিল বলে আমার মাথাটা একটু গরম হয়ে গেছিল। বাকি সব ঠিক আছে। আমি ওসবে যাবো না"।

অর্ণব বলল, "ঠিক আছে। আপনি আমাকে ওর ঠিকানা দিন। আমি গিয়ে দেখা করে আসি। আর কেস ডিল করার জন্য একটা অ্যাডভান্স অ্যামাউন্ট আমাকে পাঠিয়ে দিন। হোয়াটস অ্যাপে আপনাকে আমার অ্যাকাউন্ট ডিটেলস পাঠাচ্ছি। আপাতত এক লাখ টাকা মত পাঠিয়ে দিন। বাই"।

অর্ণব ফোন রাখতেই বিদীপ্তাকে ফোন করল অতীন। বিদীপ্তা বলল, "কী হল"?

অতীন বলল, "অর্ণববাবুর বাজেট কত? এখনই অ্যাডভান্স চাইছে এক লাখ! কত টাকা লাগবে?"

বিদীপ্তা বলল, “টাকা শুনে মাথা খারাপ করছো কেন তুমি? তোমার তো এত লো ক্লাস কোন কালে ছিল না। এতো আজেবাজে ল ইয়ার নয়। স্পেশালিষ্ট লোক। উনি নিজেই সব ব্যবস্থা করে নেবেন। টাকা লাগলে দিতে হবে। ব্যাপারটা থেকে বেরোতে হবে তো, নাকি?”
অতীন বলল, “হু। বেরোতে হবে। তবে বাবার বৃদ্ধাশ্রমে এতগুলো টাকা দিয়ে এলাম। আবার এখানে দিতে হবে। টান পড়ে যাবে”।
বিদীপ্তা বলল, “টান পড়ে যাবে মানে? কত টাকা আছে তোমার?”
অতীন আমতা আমতা করে বলল, “সেভিংসে বেশি নেই। তবে টুবলাইয়ের জন্য একটা দশ লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট আছে। ওটা ভাঙতে হবে আর কী”।
বিদীপ্তা বলল, “ভাঙতে হলে ভাঙবে। সেটা নিয়ে চিন্তা করার তো কিছু নেই। তুমি একটা গর্তে পড়েছো। সেটা থেকে না বেরিয়ে ফিউচারের চিন্তা করে তো লাভ নেই তাই না?”
অতীন বলল “ঠিক আছে, তাহলে আমি ব্যাঙ্কে কথা বলে নিচ্ছি”।
বিদীপ্তা বলল, “হ্যাঁ। কথা বলে নাও। আর শোন, অর্ণবের পেমেন্টের ট্র্যাক রাখা তো তোমার কম্মো নয়, কখন কী টাকা লাগবে, ওটা আমি সামলাচ্ছি। টাকাটা ভেঙে নিয়ে আমার একাউন্টে পাঠিয়ে দাও, আমি দেখে নিচ্ছি”।
অতীন বলল, “ঠিক আছে। তুমি যেভাবে বলবে, সেভাবেই হবে”।
বিদীপ্তা বলল, “আমার সোনা। অনেক আদর তোমাকে। আদর”।
অতীন ফোনের স্পিকারকে চুমু খাওয়া শুরু করল।

অতীন ঘরে ছিল। তাকে দেখে বলল, "কোথায় ছিলি রাতে? কীরে? ফোন ধরিস নি কেন? বিরাট বড় কিছু হয়ে গেছিস নাকি?"
সার্থক ঘরে ঢুকে একটা ব্যাগে দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। অতীন বলল, "কীরে, লাটসাহেব হয়ে গেছিস নাকি?"
সার্থক ব্যাগ গুছিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
অতীন চিৎকার করছিল, "আর কোনদিন ফিরবি না তাহলে। মনে রাখিস। আর টাকার দরকার হলে আমার কাছে যেন না আসতে হয়। মাথায় রাখিস জানোয়ার ছেলে"।
সার্থক উত্তর দিল না। দরজা বন্ধ করে দিল। অতীন ঘরের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চিৎকার করে যাচ্ছিল।
সুনয়নার বাবা মাইনে পাঠিয়ে দিয়েছেন দেখে স্বস্তি হচ্ছিল খানিকটা।
এবারেও বড় লিফটটা করেই নিচে নামল। ভবেশবাবু চেয়ার জোড়া করে শুয়ে ছিলেন। অন্যান্য দিন হলে চলে যেত। আজ ডাকল। ভবেশবাবু চোখ খুলে বললেন, "কোথায় যাচ্ছো?"
সার্থক বলল, "চলে যাচ্ছি"।
ভবেশবাবু বললেন, "কোথায় যাচ্ছো ঠিক করেছো?"
সার্থক বলল, "দেখি। যেতে যখন হবেই তখন বেরিয়ে যাই"।
ভবেশবাবু বললেন, "সাবধানে যেও"।
সার্থক ভবেশবাবুকে প্রণাম করল। ভবেশবাবুর চোখে জল চলে এল, "এ দেখো, আমাকে প্রণাম করে। বোকা ছেলে"।
সার্থক হাসল। বলল, "আপনিও তো বাবার বয়সী। বাবাকেও দেখতে যাবো আজ। আসি"।
ভবেশবাবু বললেন, "এসো"।
অতনুদা রোজের মত বসে ছিল। তাকে দেখে ডাকল, "কী হে ভায়া, সেদিনের টিকেটটা দেখেছিলে?"
সার্থক বলল, "নাহ। দেখা হয় নি। আমার যা কপাল, ও আর পাইনি শিওর"।
অতনুদা বলল, "আরে দেখেছো কি? না তাও দেখো নি? অনেকেই আছে দেখে না, তারপরে দেখা যায় আর কিছু না হোক পাঁচ সাতশো পেয়ে যায়। আরে ব্রাদার, যা পাওয়া যায়, সেটাই মঙ্গল। দেখতে কি হয়? দেখো দেখো।"
অতনুদার জোরাজুরিতেই সার্থক মানিব্যাগ থেকে টিকেটটা বের করে অতনুদাকে দিলো। অতনুদা টিকেটটা নিয়ে মিলিয়ে নিয়ে বলল, "না হে, হয় নি"।
সার্থক বলল, "জানতাম। ওই জন্যই দেখি নি"।
অতনুদা বলল, "ঠিক আছে। ওভাবে কোনদিন বলবে না জানতাম। জেনেও লোকে কী করতে পারল? যেদিন কপাল খুলবে, ওরকমই খুলবে। যাই হোক, তোমাকে তো রোজের মত লাগছে না। ঠোঁটেও দেখছি

ব্যথা লাগিয়ে এসেছো। কোথায় যাচ্ছো তুমি এসব ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে”?

সার্থক বলল, “চলে যাচ্ছি। দেখি কোথায় যাওয়া যায়”।

অতনুদা বলল, “এলাকা ছেড়ে যাচ্ছো, না শহর ছেড়ে যাচ্ছো, না দেশ ছেড়ে?”

সার্থক বলল, “হবে কিছু একটা। দেশ ছাড়ছি না এটুকু জানি। দেশ ছাড়ার অউকাদ এখনো হয় নি অতনুদা”।

অতনুদা বলল, “ঠিক আছে। সাবধানে যাও। ভালো থাকো। যেখানেই লটারি কাটবে, আমার কথা মনে কোর”।

সার্থক ঘাড় নাড়ল, “ঠিক আছে। লটারি যদি নাও কাটি, যদি লটারির দোকান দেখি, তাও তোমার কথাই মনে পড়বে। চিন্তা নেই”।

ব্যাগ নিয়েই ইন্টারভিউ দিয়ে এল। অমিত ওর কথা আগে থেকে বলে রেখে ছিল। তাকে ব্যাঙ্গালোরে জয়েন করতে বলা হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। সে আগ্রহ দেখিয়ে বলল, “আমি আজকেই রওনা দি?”

ইন্টারভিউ বোর্ডের লোকেরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। একজন বললেন, “সবাই কলকাতায় পোস্টিং চায়, আর তুমি এখনই চলে যেতে চাইছো?”

সার্থক কিছুই না বলে হাসল।

রাস্তায় বেরিয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

সে শহর ছেড়ে চলে যাবে অথচ তার জন্য চোখের জল ফেলারও কেউ নেই। কী অদ্ভুত একটা জীবন তার।

ফোনে একটা মেসেজ এল। দশ হাজার টাকা ক্রেডিট হয়েছে। সে কয়েক সেকেন্ড মেসেজটার দিকে তাকিয়ে সুনয়নাকে ফোন করল। সুনয়না ফোন ধরল না। হোয়াটস অ্যাপে মেসেজ করেছে, “আমি এ টাকাটা মন থেকে তোমাকে দিলাম। ভাল থাকো তুমি। প্লিজ আমাকে ফোন করে আর বকা ঝকা কোর না। আমি আর তোমার বকা ঝকা খাবো না। আমি তোমাকে কোন দিনও বলি নি, আমাদের ব্রেক আপটা এত সহজে হয় নি। আমি রোজ কেঁদেছি। রোজ মনে হয়েছে তুমি একদিন আমাকে বলবে চাকরি পাই নি কোন অসুবিধে নেই। তুমি আমার সঙ্গে চল। তুমি কোন দিন বল নি। আমার সত্যিই কিছু করার ছিল না। রাগ করে থেকো না প্লিজ। ভাল করে খাওয়া দাওয়া করবে। তুমি বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসো, কলকাতা থেকে ট্রেনে ওঠার আগে বিরিয়ানি খেয়ে নেবে। যদি ওখানে এরকম বিরিয়ানি না পাও? ব্রেক আপই সব না জানো তো। ওসবের পরেও ভালোবাসা থেকে যায়। আমার সব দিয়ে আমি তোমাকে ভালবাসতে পারি নি। কিন্তু আমি এই সাপোর্টটুকু করতে চাই। এটা নিয়ে বকা ঝকা করবে না”।

ফোন নিয়ে ফুটপাথে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সার্থক। কী বলবে, এ টাকা ফেরত দেবে নাকি, কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলো না...

তার প্রথম চাকরি পাওয়ার দিনটা ভারি অদ্ভুত ছিল। ভারত পাকিস্তান ম্যাচ ছিল সেদিন।
অতীন পাড়ার মোড়ে ক্যারাম খেলতে গেছিল।
ফিরে এসে দেখল বাবার হাতে একটা চিঠি এসেছে। তাকে দেখে বাবার মুখে যেন হাজার ওয়াটের আলো জ্বলে উঠল, “দ্যাখ কী এসেছে”।
সেদিন রাতে বাবা কী কিনবে বুঝতে না পেরে একটা ওয়াল ক্লক কিনে এনেছিল। আর কোন ঘড়ি ঠিক থাকুক না থাকুক, হলুদ রঙের সেই ওয়াল ক্লকটা নিয়মিত ব্যাটারি চেঞ্জ করা হয়। এই গল্পটা অহনাকে বলেছিল সে। অহনাই সে ঘড়িটার খেয়াল রাখতো। কোথাও যাওয়ার আগে সে ঘড়িটায় সময় দেখে বেরোনো অভ্যাস করে নিয়েছে অতীন। বেরোনোর আগে দেখা গেল সেই ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। আর দিন পেলো না। রাতে ফ্ল্যাটে ফেরার সময় মনে করে ঘড়ির ব্যাটারি কিনে নিয়ে আসতে হবে। মোবাইলের টু ডু লিস্টে সেটা লিখে রাখল সে।
অফিস যাওয়ার আগে ব্যাঙ্কে যেতে হবে। টুবলাইয়ের নামে বানানো ডিপোজিট সার্টিফিকেটটা প্রথমে খুঁজে পাচ্ছিল না সে। শুরুতেই মনে হল, এটা কি অহনা নিয়ে গেছে? তারপর মনে পড়ল এই সার্টিফিকেটগুলো সেই আলাদা করে রেখেছিল অন্য একটা ব্রিফকেসে। আরেকবার খুঁজতে পাওয়া গেলো।
আগের দিন ফ্ল্যাটে লক করতে ভুলে গিয়েছিল সে। এদিন ভুলল না। লিফট করে নিচে নামতে ভবেশবাবুর সামনে পড়ে গেল অতীন। তাকে দেখা মাত্র ভবেশবাবু বললেন, “ভাই চলে গেলো তো”।
অতীন গাড়ির দিকে যেতে যেতে বলল, “হু”।
ভবেশবাবু আর কিছু বললেন না।
অতীনের মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। অদ্ভুত লোক একটা। ভাইয়ের কথা কি এর থেকে শুনতে হবে তাকে? সোসাইটিতে ভবেশবাবুর নামে বলবে ঠিক করল। জানাতে হবে লোকের নামে খোঁজ খবর শুরু করেছে আজকাল। সারাদিন বসে থাকা ছাড়া তো কোন কাজ নেই।
তাকে গিল্টি ফিল করাতে চাইছে আর কী! কত সাহস। এদিকে তার দেওয়া মেন্টেনেন্সের টাকাতেই মাইনে পায় লোকটা।
ফিক্সড ডিপোজিটটা ভাঙাতে হবে। কতগুলো টাকা কত জায়গায় দেওয়ার আছে।
ব্যাঙ্কে ঢোকার ঠিক আগে গাড়িটা পার্ক করে অতীন সেভিংসের ব্যালেন্স চেক করতে গিয়ে টের পেল তার মাথাটা ঘুরে গেছে হঠাৎ। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে! মাত্র পাঁচ হাজার টাকা পড়ে রয়েছে। খেয়ালই ছিল না দু দিন ধরে এত টাকা খরচা হয়ে যাচ্ছে। বিদীপ্তাকেও সকালে টাকা দিল, ল ইয়ারকে দিল, গতকাল বাবার বৃদ্ধাশ্রমে টাকা দিতে হয়েছে। ব্যাঙ্কের মেসেজ কোন কালে দেখা হয় না। সেভিংস অ্যাকাউন্টের ব্যাল্যান্স দেখার প্রয়োজন পড়তো না এত টাকা থাকতো। ব্যালেন্সটা দেখে সে অবিশ্বাসের চোখে ফোনের দিকে তাকিয়ে রইল। ঠিক কতটা খরচা করলে অ্যাকাউন্ট এতটা ফাঁকা হয়ে যেতে পারে?

একটা ক্রেডিট কার্ডে অটো ডেবিট করা ছিল, কার্ডটা বিদীপ্তাকে দিয়েছিল সে। এত বিল করেছে জানতো না, ব্যাঙ্কে ঢোকার আগে স্টেটমেন্ট চেক করতে গিয়ে দেখল আড়াই লাখ টাকা ওখান থেকে কেটে নিয়েছে। ব্যাঙ্কে ঢোকার আগে কেমন ঝাপসা ঠেকছিল সব।

"এই ফিক্সড ডিপোজিটটা ভাঙাতে হবে স্যার?"

ব্যাঙ্কের লোকটার সপ্রশ্ন চাউনিটা দেখে রেগে গেল সে, ব্যাঙ্কের মধ্যেই চিৎকার করতে শুরু করে দিল,

"কেন বলুন তো? আমার ফিক্সড ডিপোজিট, আমি ভাঙাবো, আপনার বাবার কী?"

লোকটা উঠে দাঁড়ালো। ব্যাঙ্কের ভেতরে আসা সবাই তার দিকে বিরক্ত মুখে তাকাচ্ছে।

ম্যানেজার এগিয়ে এলেন, "স্যার আপনাকে ডিস্টার্বড মনে হচ্ছে। আপনি আমার চেম্বারে এসে বসুন"।

অতীন বলল, "আমি কোথাও যাবো না। বাঞ্চ অফ সোয়াইনস, ইয়ার্কি মারছেন? আমি আমার ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙবো নাকি আপনারা বলে দেবেন?"

ম্যানেজার ব্যাঙ্ক কর্মীটির সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে এসে বললেন, "স্যার, আপনার এই ফিক্সড ডিপোজিটটা ৫ বছরের লক ইন পিরিয়ডে করা হয়েছিল। এই ডিপোজিটটা এখনই ভাঙা যাবে না। কিছু করার নেই স্যার। প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড!"

অতীন দৃশ্যত লাফাতে শুরু করল।

ম্যানেজার প্রথমে তাকে বোঝাতে গেলেন, অতীন বুঝল না। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাঙ্কের নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে বাইরে বের করে দিল।

"তখনই বোঝা উচিত ছিল, ঘড়িটাই বন্ধ হয়ে গিয়ে বুঝিয়েছিল। ওই বন্ধ ঘড়িটাই অপয়া"!

পায়চারি করতে করতে বিদীপ্তাকে ফোন করল অতীন।

বিদীপ্তা ফোন ধরে বলল, "বল সোনা"।

অতীন বলল, "আরে তুমি ক্রেডিট কার্ডে আড়াই লাখ টাকা বিল করেছো? কী কিনেছো তুমি?"

বিদীপ্তা বলল, "মানে? এখন থেকেই তুমি হিসেব চাওয়া শুরু করে দিয়েছো?"

অতীনের মাথায় রক্ত উঠে গেলো, "হিসেব চাওয়া শুরু করেছি? এখানে হিসেব চাওয়ার কী আছে? আমার কার্ড, আমি বুঝবো"।

বিদীপ্তা বলল, "কী হয়েছে তোমার? অদ্ভুত তো! এরকম করছো কেন?"

অতীন বলল, "এরকম করছি কেন? কেন এরকম করছি? চার লাখ টাকা তিন দিন আগে ছিল, সব খরচা হয়ে গেছে। এবার আমি কী করবো?"

বিদীপ্তা বলল, "এই তো বললে ফিক্সডটা ভাঙাবে!"

অতীন বলল, "ভাঙানো যাবে না। লকড আছে। স্যালারির যে টাকা ছিল, তার সবই চলে গেছে। তুমি লাস্ট মান্থেও দেড় লাখ টাকা নিলে। এক লাখ টাকা ক্রেডিট কার্ডের বিল করেছিলে। তখন খেয়ালই করি নি। তোমাকে তার আগের মাসেই আমি একটা তিন লাখ টাকার জুয়েলারি দিয়েছিলাম। তুমি এক কাজ কর, আমাকে দু লাখ টাকা মত ধার দাও। পরের মাসে শোধ করে দিচ্ছি"।

"কী ধার? এ আবার কী? তুমি কি ভিখিরি হয়ে গেলে নাকি? হ্যালো, হ্যালো"...

অতীন বলল, "হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি"।

ফোনটা কেটে গেল।

অতীন আবার বিদীপ্তার নাম্বারে ফোন করল। বিদীপ্তা ধরে বলল, "আমি মিটিঙে আছি"।

অতীন বলল, "তোমার মিটিঙে লাথ মারি। তুমি আমার কথা শোনো। তুমি এত টাকা নিয়ে কী করছো?"

বিদীপ্তা বলল, "মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ। তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছো কেন? তোমার মত ভিখিরির বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলাই ভুল হয়েছে আমার। দেড় দু লাখ টাকার জন্য এরকম করছো কেন

তুমি? তোমাকে আমি একজন হাই সোসাইটির মানুষ বলে ভেবে এসেছি। ভেতরে ভেতরে তুমি তো দেখছি তোমার ফ্যামিলির লোকদের মতই!"

অতীন রাস্তার মধ্যে চিৎকার করতে শুরু করল, "দেড় দু লাখ, হিসেব করে দেখেছো কত টাকা নিয়েছো তুমি? এর মধ্যে দশ বারো লাখ টাকা হয়ে গেছে। আর অহনাকে দেখো, অহনাকে দেখে শেখো। আমার কার্ডগুলো ওর কাছে থাকলেও কোনদিন খরচা করে নি। উল্টে টাকা জমিয়ে গেছে"।

বিদীপ্তা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "তাহলে তো মিটেই গেলো। ওর সঙ্গেই থাকো তুমি। ইউ ক্যান্ট অ্যাফর্ড মি। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল"।

অতীন বলল, "আমার সংসারটা ভেঙে দিয়ে তুই বলছিস আমি তোকে অ্যাফর্ড করতে পারি না?"

বিদীপ্তা বলল, "আমি তোমাকে বলেছিলাম শুধু, জোর করেছিলাম কি? ভেবে দেখো তুমি কী বলছো। ভাল করে ভেবে দেখো"।

অতীন গালাগাল দেওয়া শুরু করল। রাস্তার লোকজন হাঁ করে তাকে দেখছে। বিদীপ্তা ফোন কেটে দিল।

অতীন রাস্তার উপরেই বসে পড়ল। লোকজন এসে তার মাথায় জল ঢালা শুরু করল।

হতভম্ভ মুখে অতীন শুধু একটা কথাই বলল, "এ আমি কী করলাম?"

রিজার্ভেশন পাওয়ার কথা ছিল না। স্টেশনে এসে দেখা গেল ভয়াবহ ভিড়। কলকাতার সবাই মনে হয় ব্যাঙ্গালোর চলে যাচ্ছে। তার আশঙ্কা ছিল কারেন্ট রিজার্ভেশন পাবে না। সে আশঙ্কা সত্যি হল। রিজার্ভেশন পাওয়া গেল না। জেনারেল কামরাতেই বসে যেতে হবে। তার জন্যও অনেক ঝামেলা। সার্থকের কিছু করার নেই। সে একজন কুলিকে জোগাড় করেছে। কুলির পেছন পেছন ঘুরছে। কুলি বলেছে তাকে তুলে দেবে, কিন্তু সার্থকের বিশ্বাস নেই। পিছু ছাড়ছে না।

শেষমেশ কুলি বিরক্ত হয়ে বলেছে, "আরে বাবুয়া, আপ চিন্তা কাহে করতা হ্যায়? আপ যাইয়ে, যা কর বৈঁঠিয়ে উশ পালিটফর্ম মে। মে আপকা সিট দিলা দুঙ্গা। লাইন মে হামারা লোগ রহেগা। আপ যা কর আরামসে বৈঁঠিয়ে"।

অগত্যা সে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসল। বসার পর থেকে টের পেলো কুলিটিকে সে আর দেখতে পাচ্ছে না। ভূতের গল্পের মত তার "শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল"। একটা জায়গায় হঠাৎ করে লাইন শুরু হয়েছে। এটাই কি ট্রেনের জেনারেল কামরায় ওঠার লাইন? সে শিহরিত হল। কত কত লোক! এরা সবাই জেনারেলে যাবে! এদের কারো কনফার্মড টিকেট নেই? এরা সবাই একজন না একজন কুলিকে ধরেছে? কী ভয়ানক!

তার মোবাইলে অতীনের একটার পর একটা ফোন এসে যাচ্ছে। সার্থক ধরে নি। পঁয়ত্রিশ নম্বর ফোনটা যখন এলো, তখন বিরক্ত হয়ে ধরে বলল, "কী হয়েছে? বার বার ফোন করছিস কেন?"

"ভাই, এ ভাই"।

বলে ও প্রান্তে কাঁদতে শুরু করে দিলো অতীন।

সার্থক অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন?"

অতীন কেঁদে যাচ্ছে। কোন কথা বলতে পারছে না। সার্থকের বুকটা ধক করে উঠল। অতীন শেষ এরকম কেঁদেছিল যখন মা মারা যাওয়ার খবরটা তাকে দিয়েছিল। তবে কি বাবার কিছু হল? স্টেশনে আসার আগেও তো সে বাবাকে দেখে এসেছিল। বাবা ঠিকই ছিল। তার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে ছিল। সার্থক বাবার সামনেই কেঁদে ফেলেছিল।

বৃদ্ধাশ্রমের লোকজন নিশ্চয়ই ভেবেছিল, এ ছেলে এতো কাঁদছে তাহলে বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়েছিল কেন?

সে বলল, "কী হয়েছে? বাবার কী হয়েছে?"

অতীন আরো কাঁদতে লাগলো। যে কুলিকে সার্থক খুঁজছিল, সে চলে এসেছে। তাকে দেখে বলল, "চলিয়ে বাবুয়া, সিট আপকো মিল জায়েগা। বহুত পরেশানিকে বাদ সিট মিলা হ্যায়, লেকিন এক বাত ইয়াদ রাখনা। বাথরুম মত জানা। অগর আপ বাথরুম যাওগে তো সিট ও লগ লে লেগা"।

সার্থক বলল, "আমার হবে না ভাই। শায়দ মেরে বাপ মর গায়া। হামে জানা হোগা"।

কুলি কিছু বলার আগে সে দৌড় দিল। দৌড়তে দৌড়তে অহনাকে ফোন করল। অহনা ফোন ধরে বলল, "বল"।

সার্থক বলল, "বউদি, মনে হচ্ছে খারাপ খবর আছে"।

অহনা বলল, "মানে?"

সার্থক বলল, "দাদা ফোন করে খুব কান্নাকাটি করছে। মনে হচ্ছে বাবা আর নেই"।

অহনা চুপ করে গেলো। তারপর বলল, "যাও। গিয়ে দেখো। আমি আর কী বলবো"।

সার্থক ট্যাক্সি নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে পৌঁছল। বৃদ্ধাশ্রমের গেট বন্ধ ছিল। সে সিকিউরিটিকে ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে তুলল, "ও দাদা। দরজা খুলুন। প্লিজ। ও দাদা"।

সিকিউরিটি ঘুম চোখে এসে বলল, "কী হল?"

সার্থক বলল, "আমার বাবা এখানে থাকেন। মারা গেছেন মনে হয়"। সিকিউরিটি তার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, "মদ খেয়ে এখানে আসবেন না। পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবো কিন্তু"।

সার্থক অবাক হয়ে সিকিউরিটির দিকে তাকিয়ে বলল, "কেউ মারা যায় নি?"

সিকিউরিটি বিরক্ত মুখে বলল, "না। রোজ কেউ না কেউ মারা যান। আজ মরেন নি। আপনি যান"।

সার্থক অতীনকে ফোন করল। অতীন ফোন ধরে আবার হাউ মাউ করে কান্না জুড়ে দিলো। কিছুতেই কথা বলতে পারছে না। আবার একটা ট্যাক্সিতে উঠল সে। ফ্ল্যাটের সামনে যখন পৌঁছল তখন রাত বারোটা। ভবেশবাবু বাইরেই ঘুমোচ্ছিলেন। সার্থক ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দেখল অতীন মেঝেতে বসে আছে। সে অতীনের সামনে গিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

অতীন বলল, "আমার সব টাকা নিয়ে নিয়েছে। ভাগ্যিস টুবলাইয়ের জন্য যে ফিক্সড ডিপোজিটটা করেছিলাম, সেটা পায় নি। পেলে সেটাও নিতো"।

সার্থক অবাক হয়ে বলল, "কে নিয়েছে? বউদি?"

অতীন তার দিকে হতাশ মুখে তাকিয়ে বলল, "বউদি কেন হবে? ওই মেয়েটা। আমাদের সব শেষ করে দিল। তোর বউদি কি কোনদিন আমার থেকে টাকা নিয়েছে? ছি ছি ছি, কত কিছু বলেছিলাম"।

কপাল চাপড়াতে শুরু করল অতীন।

সার্থক অন্য ঘরে গিয়ে অহনাকে ফোন করে সব বলল। অহনা একই রকম ঠাণ্ডা, নিঃস্পৃহ গলায় বলল, "হ্যাঁ। ব্যাপারটা এরকম হবারও একটা চান্স ছিল। তবে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেলো আর কী"!

সার্থক বলল, "আমি কী করবো এবার? দাদাকে ছেড়ে গেলে আবার যদি উলটো পাল্টা কিছু করে বসে? কিন্তু আমার চাকরিটা দরকার ছিল বউদি"।

অহনা বলল, "আমি আর ফিরবো না এটা নিশ্চিত। তোমার দাদা নিশ্চয়ই কাল পরশুর মধ্যে একটু স্বাভাবিক হবে। তুমি তারপরে যাও"।

সার্থক বলল, "নেশাটা নেমেছে। অনুশোচনা করছে। এবার তুমি ফিরলে কি খুব অসুবিধে হতো"?

অহনা সার্থকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "ঘুমোও তোমরা। রাত হয়েছে। আমি আর কথা বললে টুবলাই জেগে যেতে পারে। রাখলাম"।

ফোন রেখে সার্থক চুপ করে বসে রইল।

ছোটবেলায় মা বলতো, কাঁচ একবার ভেঙে গেলে আর জোড়া যায় না। দু তিন দিনের ঝড়ে তারা সবাই এমনভাবে ভেঙেছে, আর বোধ হয় জোড়া লাগানো যাবে না।

অতীনের কাছে গিয়ে বসল সার্থক। অতীন একটা কাগজে শুধু হিসেব লিখে যাচ্ছে, "এই যে, অগাস্টে বিল করেছিল দেড় লাখ, সেপ্টেম্বরে এক লাখ দশ... আমি তো জানতাম, সব ট্রান্সজাকশানের এস এম এস আসতো আমার কাছে। আমি দেখি নি? ছি ছি ছি... আমি কী করেছি! ছি!"

সার্থকের মনে পড়ল সকালেও সে ব্যাঙ্গালোর যাবার ট্রেনের টিকেটের টাকা জোগাড় করে উঠে পারছিল না। একজন মানুষের এত কী টাকা লাগে? কী করে এত এত টাকা নিয়ে এরা?

"তুইও চলে যাবি ভাই? তোর বউদি তো আর ফিরলো না। আমি এখানে একা একা কী করবো?"
অতীন কাতর গলায় বলল।
সার্থক বলল, "এখানে তো আর চাকরি বাকরি হল না। বসে থেকে কী করবো? চলে যাওয়াই ভালো"।
অতীন অনেক চেষ্টা করল। অবশেষে সার্থকের যাওয়া এক মাস পিছনো গেলো। অতীন বিভিন্ন রকম পথ খোঁজার চেষ্টা করে যায়, "শোন, তোর বউদিকে যদি বলা যায় তুই অসুস্থ, তাহলে কি আসবে?"
সার্থক বলল, "বউদি কোনভাবেই আসবে না। এসব নিয়ে অকারণে ভেবে মাথা খারাপ করিস না। তুই ওর জায়গায় থাকলে কী করতিস?"
অতীন মাথা চুলকায়, একা একা কথা বলে।
সার্থক বোঝে তার মেধাবী দাদাটা ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছে। বউদিকে লুকিয়ে ফোন করেছিল সে। অহনা শান্ত গলায় জানিয়ে দিয়েছে কোন ভাবেই সে আর ফিরে আসবে না। সার্থক জোর করতে পারে নি। জোর করে কোন লাভ হবে না বুঝে গেছে সে।
রাঙা পিসি বাবাকে নিয়ে গেছে তার কাছে।
অতীন সেটা নিয়ে আর কোন প্রতিবাদ করে নি।
অফিস থেকে ফিরে এসে বসে বসে টিভি দেখে আর টুবলাইয়ের খেলনাগুলো নিয়ে খেলে।
মিসেস সেন আরেকদিন এসেছিলেন। অতীনকে বললেন, "অহনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু করলে ভাই?"
অতীন মিসেস সেনের হাত ধরে বলেছে, "আমার কথা শুনবে না, আপনি একবার চেষ্টা করে দেখবেন?"
মিসেস সেন অতীনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "আমি?"
অতীন বলল, "আপনিই পারবেন। আপনি ছাড়া হবে না"। মিসেস সেন কী বলবেন বুঝতে না পেরে পালিয়ে গেলেন।
অর্ণব একদিন অতীনকে ফোন করল, "আপনার কেসটা নিয়ে আমি কথা বলেছি। হয়ে যাবে বুঝলেন। আর কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে পারেন?"
অতীন তার ফোনে বাছা বাছা গালাগালি রেকর্ড করে রেখেছিল। অর্ণব ফোন করতে সেগুলো চালিয়ে দিলো।
দশদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নিলো অতীন। প্রতিদিনই অহনাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়, মাঝরাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলে, "নাহ, থাক। ওরা ভালো থাক। আর চেষ্টা করে লাভ নেই"।
পিসির বাড়ি যায়। বাবার কাছে গিয়ে বসে। বাবা ঘুমিয়ে থাকে, অতীন কথা বলে, "বুঝলে বাবা, কোন কোন ভুল আছে, যেগুলো একবার করে ফেললে আর কিচ্ছু করার থাকে না। যত চেষ্টাই করা যায়, সে ভুল আর ঠিক করা যায় না। বিরাট ভুল করে ফেলেছি বুঝলে?"

ঘুম ভাঙলে বাবা তার দিকে তাকায়। অতীন দুঃখী চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। রাঙা পিসিকে একবার বলেছিল বাবাকে নিয়ে যাবার কথা। রাঙা পিসি বলে দিয়েছে কোন দরকার নেই। বউমা না এলে দাদাকে পাঠাবো না।

অতীন সঙ্গে সঙ্গে অহনাকে ফোন করেছে। যথারীতি অহনা ফোন ধরে নি।

সার্থকের সঙ্গে একদিন অতীন হাঁটতে বেরোল। অতনুদার দোকান থেকে একটা লটারির টিকেটও কাটলো। টিকেট কেটে সার্থককে বলল, "টাকাটা পেলে ভাল হয় বুঝলি, অনেক ঝামেলা কমে"।

রেজাল্ট বেরোতে দেখা গেলো কিছুই পাওয়া যায় নি। অতীন দুঃখিত মুখে মাথা নাড়ায়, "কপালে না থাকলে কিচ্ছু হবে না। সব গেছে বুঝলি, আর কিছু নেই। কপাল জিনিসটাই আমার চলে গেছে"।

একদিন ভোর বেলা উঠে তাকে ডেকে দিয়ে অতীন বলল, "বুঝলি ভাই, স্বপ্ন দেখলাম তোর বউদি চলে এসেছে। টুবলাইয়ের স্যার এসেছেন। আবার বাড়ি ভর্তি লোক। ভোরের স্বপ্ন সত্যি হবার হাই চান্স আছে, কী বলিস?"

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে গেলো।

ছুটির দশদিন পার হল। বাগচী ফোন করে অতীনকে বলে দিয়েছেন প্রোমোশনটা আপাতত অতীন পাচ্ছে না। অতীন শুনে গেলো শুধু। কিছু বলল না।

এগারো দিনের মাথায় সার্থক দেখল অতীন গম্ভীর মুখে ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে নিয়ে অফিস চলে গেলো। আগের সব পাগলামি অদৃশ্য।

অফিস থেকে ফিরে এসে বলল, "স্যালারি হয়েছে আজ। তুই তোর বউদির সঙ্গে কথা বল। বাচ্চাটাকে বড় করতে হবে। আমার উপর রাগ দেখাচ্ছে ঠিক আছে, কিন্তু আমার টাকায় ওরও অধিকার আছে। ভাল করে থাকুক। কষ্ট করার কিছু নেই। জানিয়ে দে। আর তোকে আমি ব্যাঙ্গালোরে দিয়ে আসবো। প্লেনে যাবো। অনেক বাজে খরচ করেছি, এবার কাজে খরচা করি। ডেটটা জানাস"।

সার্থক বলল, "ও আমি চলে যাবো। প্লেনে যাবার কী হল আবার?"

অতীন বলল, "না। আমি দিয়ে আসবো"।

সার্থক আর কিছু বলল না। যদি এসব করে দাদা স্বাভাবিক হতে চায়, তবে হোক। বারণ করে লাভ নেই।

এক রবিবার দুপুরে সার্থক সুনয়নাদের বাড়ি গেল। প্ল্যান করে যায় নি। খেয়ে দেয়ে হঠাৎ করে মনে হল ঘুরে আসা যায়। প্রথম মাইনে পেয়ে মেয়েটাকে টাকা পাঠিয়ে দেবে। বললে হয়তো নেবে না। অতো কিছু লিখেছিল। তারা হয়তো কেউই কাউকে ভালোবাসে নি সেভাবে। ভালবাসলে কি দুজনেই এতো অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারতো? ভালোবাসা হয় নি। পাটিগণিত হয়েছিল হয়তো।

লাভ ক্ষতির ভাগশেষে সব শেষ হয়ে গেছে।

গলির মুখ থেকেই বড় গাড়িটা দেখা গেলো। সুনয়নাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সুনয়নাদের ছাদটা ভারি সুন্দর। একগাদা ফুলের টব রাখা থাকে। ঝলমল করে।

সে ঝলমলে ফুলের আলোতে দেখা গেল একটা ছেলের সঙ্গে সুনয়না খুব গল্প করছে। সার্থক সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলো।

নিজেকে আড়াল করে নিল।

থাক। সেই তো তাকে শহর ছেড়ে চলেই যেতে হবে।

অনেকটা পথ হাঁটল সেদিন সে। মন খারাপ কাটাতে হাঁটার বিকল্প নেই। নিজেকেই প্রশ্ন করলো পথের শেষে।

কাউকে একটুও ভাল না বাসলে কেন মন খারাপ হবে?

রাতে ফ্ল্যাটে এসে দেখল অতীন ফিক ফিক করে হাসছে।

সে বলল, “কী হয়েছে? হাসছিস কেন?”
অতীন বলল, “বিদীপ্তা আমার কার্ডগুলো ফেরত দিতে এসেছিলো?”
সার্থক রেগে গেলো, “আবার?”
অতীন বলল, “হ্যাঁ”।
সার্থক বলল, “তাহলে আর কী? মিটে গেছে?”
অতীন বলল, “মেটানোর কথা তো বলছি না”।
সার্থক বলল, “তবে?”
অতীন বলল, “লিফটে কুড়ি মিনিট আটকে ছিল। ভবেশবাবু চাবি হারিয়ে ফেলেছিলেন বলে এতো দেরী! গলদঘর্ম হয়ে পালিয়েছে। আর এ জন্মে এ মুখো হবে না”।
এবার সার্থকও হাসল।
এই হাসিটুকুই থাকল। সুখের দিনগুলো তো সেই কবেই চলে গেছে...
#
দুপুরে খেতে এসেছিল অনীশ। কাজের তাড়া থাকে। ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। অহনা খেতে দিচ্ছিল। অনীশের অস্বস্তি হচ্ছিল। কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে কিন্তু বুঝতে পারছে না সমস্যাটা কোত্থেকে হচ্ছে। অহনা তাকে খেতে দিয়ে বসল।
খেতে খেতে ফোন এলো। অনীশ কথা বলতে বলতে আবিষ্কার করল তার দিদি সিঁদুর মুছে ফেলেছে। হাতও খালি। ফোনটা কথার মাঝপথেই কেটে দিয়ে বলল, “তুই সিঁদুর মুছে ফেলেছিস?”
অহনা বলল, “হ্যাঁ। প্রথমে সাদা শাড়ি পরব ভেবেছিলাম। তারপর মনে হল বিশ্বাসটা মরেছে, সম্পর্কটা মরেছে, সেটার জন্য আমার কষ্ট করার কোন দরকার নেই। ছেলেটা ছোট থেকেই ঠিক শিখে বড় হোক”।
অনীশ কিছু বলল না। দিদি যখন ঠিক করেই নিয়েছে, কিছু বলে লাভ নেই। শিবেরও সাধ্যি নেই এর অন্যথা করার।
আবার খেতে শুরু করে দিল সে।
।।পুনশ্চ।।
সে একটা অসমাপ্ত গল্পের মাঝপথে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এয়ারপোর্টে কত লোক!
অসংখ্য মানুষ! কেউ বেড়াতে যাচ্ছে। কেউ হানিমুনে। কেউ বা তারই মত শহর ছেড়ে যাচ্ছে।
সিকিউরিটি করে দাদার সঙ্গে বসেছিল সে। অতীন বলল, “কফি খাবি”?
সার্থক বলল, “না। প্রচুর দাম। তোকেও খেতে হবে না। সেভিং কর”।
অতীন বলল, “ওই যে বাচ্চাটা হাঁটছে, টুবলাইয়ের মত লাগছে না? কী দুরন্ত দেখ?”
সার্থক দেখে বলল, “কোন মিল নেই। তোর যদি খুব কষ্ট হয়, তুই টুবলাইকে দেখে আসতে পারিস”।
অতীন কিছু বলল না। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ নিবিষ্ট মনে পকেট থেকে একটা লটারির টিকেট বের করে ফোনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে একটা লাফ দিল।
সবাই অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলো।
সার্থক বলল, “কী রে? কত পেলি?”
অতীন বলল, “ছ’শো পেয়েছি মনে হয় একটা। দেখ তো”।
সার্থক চেক করে বলল, “কাল রাতের রেজাল্ট দেখেছিস। পাস নি কিছু”।
অতীন বলল, “ধুস, আর কাটবো না”।
সার্থক হাসল, “কাটিস না। খামোখা টাকা নষ্ট করিস না। নেশা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু”।

অতীন বলল, "ঠিক। নেশা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ রে, কত কিছু করার ছিল জীবনে, কিছুই হল না বল? কীসব করে ফেললাম, সব শেষ হয়ে গেল"!

সার্থক দাদার দিকে তাকালো।

কত চুল পেকে গেছে এ ক'দিনে!

বলল, "তোকে অনেকটা বাবার মত দেখতে লাগছে"।

অতীন বলল, "আমাকে আর টুবলাই বৃদ্ধাশ্রমে দিতে পারবে না। থাকিই না তো একসঙ্গে"।

সার্থকের চোখে বিনা কারণে জল চলে এলো।

কী অদ্ভুত! সে শহর ছেড়ে যাচ্ছে, অথচ বাবাকে দেখে এলো না তো! সে ভুলে গেলো কী করে?

বোর্ডিং কল এসেছে। লাইন পড়ে গেছে।

নির্দিষ্ট সিট, কেউ অন্যের সিটে বসবে না, তবু মানুষের কত তাড়া!

অতীন বলল, "ধীরে সুস্থে চল, কোন তাড়া নেই"।

তারা লাইনের শেষে দাঁড়ালো। অতীন বলল, "মাঝে মাঝে তোকে দেখতে যাবো। তুইও আসিস। একা থাকার বড় জ্বালা"।

সার্থক মনে মনে হাসল। এ সবই কথার কথা। শেষমেশ সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ফিকে হতে হতে সম্পর্কগুলো নিভতে শুরু করবে নিজেদের অজান্তেই। বাবার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের মত।

কিছুক্ষণ পর প্লেন টেক অফ করল।

শহরটা কিছুক্ষণ জ্বলে থেকে ধীরে ধীরে নিভে গেল...

মা ছোটবেলায় সুমন কল্যাণপুরের একটা গান করতো। সে গানের কথাগুলো ফিসফিস করে বলল সার্থক,

"আমার স্বপ্ন দেখার দুটি নয়ন, হারিয়ে গেল কোথায় কখন,
কেউ তা জানে না..."

সমাপ্ত

পড়ে ভালো লাগলে বই কিনে রাখুন, এই রকম আরো বই পড়তে আমাদের টেলিগ্রামে জয়েন করুন